জমি রেজিস্ট্রেশনের নিয়ম, সবার জেনে রাখা দরকার

জমি রেজিস্ট্রেশনেরবাংলাদেশে প্রযোজ্য সম্পত্তি হস্তান্তর (সংশোধন) আইন ২০০৪ এর ৫৪এ ধারা অনুসারে অস্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় চুক্তি হবে লিখিত ও রেজিস্ট্রিকৃত। সুনির্দিষ্ট প্রতিকার (সংশোধন) আইন ২০০৪ এর ২১এ ধারার বিধান অনুসারে আদালতের মাধ্যমে চুক্তি বলবতের দুই শর্ত হলোঃ

- লিখিত ও রেজিস্ট্রিকৃত বায়না ব্যতীত চুক্তি প্রবলের মামলা আদালতের মাধ্যমে বলবৎ করা যাবে না।
- বায়নার অবশিষ্ট টাকা আদালতে জমা না করলে মামলা দায়ের করা যাবে না।

রেজিস্ট্রেশনের সময় যে সকল কাগজপত্র প্রদান করতে হয়:

- দলিল রেজিস্ট্রারিং অফিসার এ আইনে নতুন সংযোজিত ৫২এ ধারার বিধান অনুসারে বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপিত কোন দলিল রেজিস্ট্রি করা হয় না যদি দলিলের সাথে নিচের কাগজগুলো সংযুক্ত থাকে:
- রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ এর বিধান অনুসারে প্রস্তুতকৃত সম্পত্তির সর্বশেষ খতিয়ান, বিক্রেতার নাম যদি তিনি উত্তরাধিকার সূত্র ব্যতীত অন্যভাবে সম্পত্তির মালিক হয়ে থাকেন।
- প্রজাস্বত্ব আইনের বিধান অনুসারে প্রস্তুতকৃত সর্বশেষ খতিয়ান, বিক্রেতার নাম বা বিক্রেতার পূর্বসূরীর নাম যদি তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে ঐ সম্পত্তি পেয়ে থাকেন।
- সম্পত্তির প্রকৃতি।
- সম্পত্তির মূল্য।
- চতুর্সীমা সহ সম্পত্তির নকশা।
- বিগত ২৫ বৎসরের মালিকানা সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ।
- দাতা কর্তৃক এ মর্মে একটি হলফনামা (□□□□□□□□□□) সম্পাদন করতে হবে যে তিনি উক্ত সম্পত্তি ইতোপূর্বে কারো নিকট বিক্রি করেননি এবং তিনিই দলিলে উল্লেখিত সম্পত্তির মালিক (He has Lawful Title)।

বিক্রয় বা সাফ কবলা দলিলের রেজিস্ট্রেশন ব্যয় নিম্নরূপ:

২০০৯ সালের অক্টোবর থেকে পৌর এলাকা ভুক্ত এলাকার জন্য:

ননজুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্প (সম্পত্তির মূল্যের)	৩.০%
সরকারী রেজি: ফি (যা রেজিষ্ট্রি অফিসে নগদ জমা দিতে হয়)	২.০%
স্থানীয় সরকার ফি (যা রেজিষ্ট্রি নগদ জমা দিতে হয়)	১.০ %
উৎস কর (এক লক্ষ টাকার উপরের জন্য প্রযোজ্য)	২.০%
গেইন ট্যাক্স (পৌর/ সিটি কর্পোরেসনে জমা দিতে হয়)	১.০ %
মোট =	৯.০%

পৌর এলাকা বা সিটি কর্পোরেশন বহির্ভূত/ ইউনিয়ন পরিষদভুক্ত এলাকার জন্য:

ননজুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্প (সম্পত্তির মূল্যের)	২.০ %
সরকারী রেজি: ফি (যা রেজিষ্ট্রি অফিসে নগদ জমা দিতে হয়)	২.০ %
স্থানীয় সরকার ফি (যা রেজিষ্ট্রি নগদ জমা দিতে হয়)	১.০ %
উৎস কর (এক লক্ষ টাকার উপরের জন্য প্রযোজ্য)	১.০ %

মোট =	৬.০%

এছাড়াও প্রতিটি দলিল রেজিষ্ট্রির সময় ৫০/= (পঞ্চাশ) টাকা মূল্যের ননজুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে হলফনামা ও একটি নোটিশ সংযুক্ত করতে হয়। উক্ত নোটিশে ১/= টাকা মূল্যের কোর্ট ফি সংযুক্ত হয়। দলিল রেজিষ্ট্রি করতে ১৫০ টাকার ননজুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে দলিল সম্পাদন করতে হয় এবং ষ্ট্যাম্পের বাদবাকী মূল্য বাংলাদেশ ব্যাংক বা সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে চালান করে, চালানের কপি সংযুক্ত করতে হয়।

দলিলের সার্টিফাইড কপি উত্তোলনের ক্ষেত্রে সরকারী ফি নিম্নরূপ:

ষ্ট্যাম্প বাবদ	২০ টাকা
কোর্ট ফি	৪ টাকা
মোট=	২৪ টাকা
লেখনী বাবদ দলিলের প্রতি ১০০ শব্দ বা অংশ বিশেষের জন্য বাংলার জন্য	৩ টাকা
প্রতি ১০০ ইংরেজী শব্দ বা অংশ বিশেষের জন্য	৫ টাকা
জরুরী নকলের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত	২০ টাকা
উক্ত নকল চার পৃষ্ঠার বেশি হলে প্রতি পৃষ্ঠার জন্য	৫ টাকা

দান দলিল রেজিস্ট্রেশন এর নিয়ম:

রেজিস্ট্রেশন (সংশোধন) আইন ২০০৪ এ নতুন সংযোজিত ৭৮এ ধারা অনুসারে স্থাবর সম্পত্তির দানপত্র দলিল অবশ্যই রেজিস্ট্রি করতে হয়। দান দলিল রেজিস্ট্রেশন ফি নিম্নরূপ:

স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা-সন্তান, দাদা-দাদী ও নাতি-নাতনী, সহোদর ভাই-ভাই, সহোদর বো-বোন এবং সহোদর ভাই ও সহোদর বোনের মধ্যে যে কোনো স্থাবর সম্পত্তির দানপত্র দলিল রেজিস্ট্রি ফি ১০০ টাকা।
উল্লিখিত সম্পর্কের বাইরের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সম্পাদিত দানপত্র দলিল রেজিস্ট্রির ফি হবে কবলা দলিল রেজিস্ট্রির জন্য প্রযোজ্য ফি’র অনুরূপ।

জীবন স্বত্বে দান দলিল রেজিস্ট্রেশন ফিঃ

স্প্যাম্প এ্যাক্ট ১৯০৮ এর ৫৮ নং আর্টিক্যাল অনুসারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, মসজিদ, মাদ্রাসা, কবরস্থান (মুসলিম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান) এর জন্য জীবন স্বত্বে দানের বিধান হলো - যে প্রতিষ্ঠানের নামে সম্পত্তি দান করা হবে সে প্রতিষ্ঠান ঐ সম্পত্তি শুধু ভোগ-দখল করতে পারবে, সম্পত্তি কোনরূপ হস্তান্তর করতে পারবে না। এরূপ জমির ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করতে হবে দানকারীর নামে। কোন কারণে ঐ প্রতিষ্ঠানটি কার্যকর না থাকলে সম্পত্তি দানকারীর মালিকানায় চলে যাবে এবং দান দলিল স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে।

ষ্ট্যাম্প ফি	২%
রেজিস্ট্রেশন ফি	২.৫%
ই ফিস	প্রযোজ্য

খতিয়ান কী ?

মৌজা ভিত্তিক এক বা একাদিক ভূমি মালিকের ভূ-সম্পত্তির বিবরন সহ যে ভূমি রেকর্ড জরিপকালে প্রস্তুত করা হয় তাকে খতিয়ান বলে।

সি,এস রেকর্ড কী ?

সি,এস হল ক্যাডাস্টাল সার্ভে। আমাদের দেশে জেলা ভিত্তিক প্রথম যে নক্সা ও ভূমি রেকর্ড প্রস্তুত করা হয় তাকে সি,এস রেকর্ড বলা হয়।

এস,এ খতিয়ান কী ?

সরকার কর্তৃক ১৯৫০ সনে জমিদারি অধিগ্রহন ও প্রজাস্বত্ব আইন জারি করার পর যে খতিয়ান প্রস্তুত করা হয় তাকে এস,এ খতিয়ান বলা হয়।

নামজারী কী ?

উত্তরাধিকার বা ক্রয় সূত্রে বা অন্য কোন প্রক্রিয়ায় কোন জমিতে কেউ নতুন মালিক হলে তার নাম খতিয়ানভূক্ত করার প্রক্রিয়াকে নামজারী বলে।

জমা খারিজ কী ?

জমা খারিজ অর্থ যৌথ জমা বিভক্ত করে আলাদা করে নতুন খতিয়ান সৃষ্টি করা। প্রজার কোন জোতের কোন জমি হস্তান্তর বা বন্টনের কারনে মূল খতিয়ান থেকে কিছু জমি নিয়ে নুতন জোত বা খতিয়ান খোলাকে জমা খারিজ বলা হয়।

পর্চা কী ?

ভূমি জরিপকালে প্রস্তুতকৃত খসরা খতিয়ান যে অনুলিপি তসদিক বা সত্যায়নের পূর্বে ভূমি মালিকের নিকট বিলি করা হয় তাকে মাঠ পর্চা বলে। রাজস্ব অফিসার কর্তৃক পর্চা সত্যায়িত বা তসদিক হওয়ার পর আপত্তি এবং আপিল শোনানির শেষে খতিয়ান চুরান্তভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর ইহার অনুলিপিকে পর্চা বলা হয়।

তফসিল কী ?

তফসিল অর্থ জমির পরিচিতিমূলক বিস্তারিত বিবরন। কোন জমির পরিচয় প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট মৌজার নাম, খতিয়ান নং, দাগ নং, জমির চৌহদ্দি, জমির পরিমান ইত্যাদি তথ্য সমৃদ্ধ বিবরনকে তফসিল বলে।

মৌজা কী ?

ক্যাডষ্টাল জরিপের সময় প্রতি থানা এলাকাকে অনোকগুলো এককে বিভক্ত করে প্রত্যেকটি একক এর ক্রমিক নং দিয়ে চিহ্নিত করে জরিপ করা হয়েছে। থানা এলাকার এরুপ প্রত্যেকটি একককে মৌজা বলে। এক বা একাদিক গ্রাম বা পাড়া নিয়ে একটি মৌজা ঘঠিত হয়।

খাজনা কী ?

ভূমি ব্যবহারের জন্য প্রজার নিকট থেকে সরকার বার্ষিক ভিত্তিতে যে ভুমি কর আদায় করে তাকে ভুমির খাজনা বলা হয়।

ওয়াকফ কী ?

ইসলামি বিধান মোতাবেক মুসলিম ভূমি মালিক কর্তৃক ধর্মীয় ও সমাজ কল্যানমুলক প্রতিষ্ঠানের ব্যায় ভার বহন করার উদ্দেশ্যে কোন সম্পত্তি দান করাকে ওয়াকফ বলে।

মোতওয়াল্লী কী ?

ওয়াকফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান যিনি করেন তাকে মোতওয়াল্লী বলে।মোতওয়াল্লী ওয়াকফ প্রশাষকের অনুমতি ব্যতিত ওয়াকফ সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারেন না।

ওয়রিশ কী ?

ওয়ারিশ অর্থ ধর্মীয় বিধানের আওতায় উত্তরাধিকারী। কোন ব্যক্তি উইল না করে মৃত্যু বরন করলে আইনের বিধান অনুযায়ী তার স্ত্রী, সন্তান বা নিকট আত্নীয়দের মধ্যে যারা তার রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে মালিক হন এমন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে ওয়ারিশ বলা হয়।

ফারায়েজ কী ?

ইসলামি বিধান মোতাবেক মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বন্টন করার নিয়ম ও প্রক্রিয়াকে ফারায়েজ বলে।
খাস জমি কী ?
ভূমি মন্ত্রনালয়ের আওতাধিন যে জমি সরকারের পক্ষে কালেক্টর তত্ত্বাবধান করেন এমন জমিকে খাস জমি বলে।
কবুলিয়ত কী ?
সরকার কর্তৃক কৃষককে জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার প্রস্তাব প্রজা কর্তৃক গ্রহন করে খাজনা প্রদানের যে অংঙ্গিকার পত্র দেওয়া হয় তাকে কবুলিয়ত বলে।
দাগ নং কী ?
মৌজায় প্রত্যেক ভূমি মালিকের জমি আলাদাভাবে বা জমির শ্রেনী ভিত্তিক প্রত্যেকটি ভূমি খন্ডকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করার লক্ষ্যে সিমানা খুটি বা আইল দিয়ে স্বরজমিনে আলাদাভাবে প্রদর্শন করা হয়। মৌজা নক্সায় প্রত্যেকটি ভূমি খন্ডকে ক্রমিক নম্বর দিয়ে জমি চিহ্নিত বা সনাক্ত করার লক্ষ্যে প্রদত্ত্ব নাম্বারকে দাগ নাম্বার বলে।
ছুট দাগ কী ?
ভূমি জরিপের প্রাথমিক পর্যায়ে নক্সা প্রস্তুত বা সংশোধনের সময় নক্সার প্রত্যেকটি ভূ-খন্ডের ক্রমিক নাম্বার দেওয়ার সময় যে ক্রমিক নাম্বার ভূলক্রমে বাদ পরে যায় অথবা প্রাথমিক পর্যায়ের পরে দুটি ভূমি খন্ড একত্রিত হওয়ার কারনে যে ক্রমিক নাম্বার বাদ দিতে হয় তাকে ছুট দাগ বলা হয়।
চান্দিনা ভিটি কী ?
হাট বাজারের স্থায়ী বা অস্থায়ী দোকান অংশের অকৃষি প্রজা স্বত্ত্য এলাকাকে চান্দিনা ভিটি বলা হয়।
অগ্রক্রয়াধিকার কী ?
অগ্রক্রয়াধিকার অর্থ সম্পত্ত্বি ক্রয় করার ক্ষেত্রে আইনানুগভাবে অন্যান্য ক্রেতার তুলনায় অগ্রাধিকার প্রাপ্যতার বিধান। কোন কৃষি জমির মালিক বা অংশিদার কোন আগন্তুকের নিকট তার অংশ বা জমি বিক্রির মাধ্যমে হস্তান্তর করলে অন্য অংশিদার কর্তৃক দলিলে বর্নিত মূল্য সহ অতিরিক্ত ১০% অর্থ বিক্রি বা অবহিত হওয়ার ৪ মাসের মধ্যে আদালতে জমা দিয়ে আদালতের মাধ্যমে জমি ক্রয় করার আইনানুগ অধিকারকে অগ্রক্রয়াধিকার বলা হয়।
আমিন কী ?
ভূমি জরিপের মধ্যমে নক্সা ও খতিয়ান প্রস্তুত ও ভূমি জরিপ কাজে নিজুক্ত কর্মচারীকে আমিন বলা হত।
সিকস্তি কী ?
নদী ভাংঙ্গনে জমি পানিতে বিলিন হয়ে যাওয়াকে সিকস্তি বলা হয়। সিকস্তি জমি ৩০ বছরের মধ্যে স্বস্থানে পয়স্তি হলে সিকস্তি হওয়ার প্রাককালে যিনি ভূমি মালিক ছিলেন, তিনি বা তাহার উত্তরাধিকারগন উক্ত জমির মালিকানা শর্ত সাপেক্ষ্যে প্রাপ্য হবেন।
পয়স্তি কী ?
নদী গর্ভ থেকে পলি মাটির চর পড়ে জমির সৃষ্টি হওয়াকে পয়স্তি বলা হয়।
নাল জমি কী ?
সমতল ২ বা ৩ ফসলি আবাদি জমিকে নাল জমি বলা হয়।
দেবোত্তর সম্পত্তি কী ?
হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির আয়োজন, ব্যাবস্থাপনা ও সু-সম্পন্ন করার ব্যয় ভার নির্বাহের লক্ষ্যে উৎসর্গকৃত ভূমিকে দেবোত্তর সম্পত্তি সম্পত্তি বলা হয়।

দাখিলা কী ?
ভূমি মালিকের নিকট হতে ভূমি কর আদায় করে যে নির্দিষ্ট ফরমে (ফরম নং-১০৭৭) ভূমিকর আদায়ের প্রমানপত্র বা রশিদ দেওয়া হয় তাকে দাখিলা বলে।
ডি,সি,আর কী ?
ভূমি কর ব্যতিত অন্যান্য সরকারি পাওনা আদায় করার পর যে নির্ধারিত ফরমে (ফরম নং-২২২) রশিদ দেওয়া হয় তাকে ডি,সি,আর বলে।
দলিল কী ?
যে কোন লিখিত বিবরনি যা ভবিষ্যতে আদালতে স্বাক্ষ্য হিসেবে গ্রহনযোগ্য তাকে দলিল বলা হয়। তবে রেজিষ্ট্রেশন আইনের বিধান মোতাবেক জমি ক্রেতা এবং বিক্রেতা সম্পত্তি হস্তান্তর করার জন্য যে চুক্তিপত্র সম্পাদন ও রেজিষ্ট্রি করেন তাকে সাধারনভাবে দলিল বলে।
কিস্তোয়ার কী ?
ভূমি জরিপকালে চতুর্ভূজ ও মোরব্বা প্রস্তুত করারপর সিকমি লাইনে চেইন চালিয়ে সঠিকভাবে খন্ড খন্ড ভূমির বাস্তব ভৌগলিক চিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে নক্সা প্রস্তুতের পদ্ধতিকে কিস্তোয়ার বলে।
খানাপুরি কী ?
জরিপের সময় মৌজা নক্সা প্রস্তুত করার পর খতিয়ান প্রস্তুতকালে খতিয়ান ফর্মের প্রত্যেকটি কলাম জরিপ কর্মচারী কর্তৃক পূরণ করার প্রক্রিয়াকে খানাপুরি বলে।

মৌজা
মৌজা রাজস্ব আদায়ের সর্বনিম্ন একক। মুগল আমলে কোনো পরগনা বা রাজস্ব-জেলার রাজস্ব আদায়ের একক হিসেবে শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হতো। একগুচ্ছ মৌজা নিয়ে গঠিত হতো একটি পরগনা। বিংশ শতাব্দীতে মৌজা শব্দটি ব্যবহৃত হয় সামাজিক একক গ্রামের বিকল্প নাম হিসেবে এবং এই নামটি বেশ জনপ্রিয়তাও লাভ করে।
ঊনবিংশ শতাব্দী এবং তারও পূর্বে মৌজা সামাজিক ও রাজস্ব উভয়েরই একক হিসেবে চিহ্নিত হতো। এমন অনেক মৌজা ছিল যেখানে সামান্য কয়েকটি বসতবাড়ি ছিল অথবা আদৌ কোন বসতবাড়ি ছিল না। মৌজা ছিল শনাক্তকরণের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য চিহ্ন। মৌজার অন্তর্গত নির্দিষ্ট পরিমাণ ভূমিতে ছিল গ্রামীণ বসতি বা স্থাপনা। স্থানীয় অবস্থাভেদে এই বসতিগুলি ছিল ছড়িয়ে ছিটিয়ে অথবা একস্থানে কেন্দ্রীভূত। কেন্দ্রীভূত স্থাপনাগুলি সামগ্রিকভাবে ‘গ্রাম’ বা ‘পল্লী’ নামে পরিচিতি লাভ করে। জরিপ বিভাগ এবং রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারীদের নিকট তাই শব্দ দুটির (মৌজা ও গ্রাম) স্বতন্ত্র অর্থ রয়েছে। রাজস্ব নির্ধারণ এবং রাজস্ব আদায়ের জন্য এক ইউনিট জমির ভৌগোলিক অভিব্যক্তি ছিল মৌজা। অন্যদিকে গ্রাম ছিল মৌজার অন্তর্ভুক্ত সামাজিক বন্ধনে গঠিত মনুষ্যবসতি। এভাবে একটি মৌজার অন্তর্গত একের অধিক গ্রাম থাকতে পারত এবং একইভাবে, একটি গ্রাম সন্নিহিত দুটি মৌজা নিয়ে গঠিত হতে পারত। বঙ্গদেশের পাললিক সমভূমিতে কেন্দ্রীভূত রীতিতে গ্রামবসতি খুব কমই গঠিত হয়েছে। ব্যক্তিক কৃষক পরিবার উন্মুক্ত মাঠে তাদের নিজস্ব ভূমির উপর বাস্তৃতভিটা নির্মাণ করা সুবিধাজনক মনে করত। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাকেরগঞ্জ জেলার সমতল ভূমিতে কদাচ গুচ্ছ বা কেন্দ্রীভূত গ্রাম ছিল। প্রতিবেশিতার বিষয় বিবেচনা না করেই এসব বসতবাড়ি নির্মাণ করা হতো। কিন্তু সিলেট ও ময়মনসিংহ জেলায় বিষয়টি এরকম ছিল না। সেখানে নদীতীরের উঁচু জমিতে কৃষকরা বৃহদাকার কেন্দ্রীয় গ্রামবসতি স্থাপন করত। উত্তরবঙ্গের জেলাসমূহে কতিপয় জলাশয়ের (পুকুর, দিঘি, ইত্যাদি) চারদিকে গুচ্ছগ্রাম নির্মাণ করা ছিল সাধারণ বৈশিষ্ট্য। একইভাবে, পরবর্তীকালে বঙ্গদেশের জেলাসমূহে ক্যাডাস্ট্রাল জরিপ

পরিচালনাকালেও মৌজাকে সর্বনিম্ন রাজস্ব একক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। স্থানীয় রাজস্ব নকশায় জুরিসডিকশন লিস্ট (জেএল) এবং রেভিনিউ সার্ভে (&আরএস) নম্বর দ্বারা একটি মৌজা শনাক্ত করা হতো।
জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং তার ফলে গ্রামসমাজের উন্নয়ন, উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা ও পানি সরবরাহ এবং ১৯৫০ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপকরণের ফলে মৌজার ধারণা দুর্বল হয়ে পড়ে। এখন নিজেদের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিচয় প্রদানকারী কতিপয় গ্রাম নিয়ে অধিকাংশ মৌজা অস্তিত্বশীল। ১৯৬২ সালের পর থেকে আদমশুমারি ও ভোটার তালিকায় মৌজার পরিবর্তে প্রাথমিকভাবে গ্রামের নাম ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অবশ্য জরিপ বা সেটেলমেন্টের রেকর্ডপত্রে মৌজা শব্দটির ব্যবহার এখনও প্রচলিত।

তালুকদার
তালুকদার একটি মিশ্র শব্দ। তা'ল-লুক আরবি শব্দ, অর্থাৎ ধরে রাখা বা নির্ভর করা। হিন্দিতে 'তালুক' শব্দটি ব্যবহৃত হয় 'জমি' অর্থে। ফারসি 'দার' শব্দটির অর্থ 'অধিকারী'। তালুকদার শব্দটির অর্থ ' ভূম্যাধিকারী'। ভারতের বিভিন্ন অংশে তালুকদার শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত। উত্তর ভারতে বড় ভূস্বামীদের তালুকদার বলা হয়। কিন্তু বাংলায় অধীনস্থ ভূমির ব্যাপ্তি ও সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে জমিদারদের পরে তালুকদারদের স্থান। আঠারো শতকে বাংলায় ছোট ছোট ভূস্বামীদের স্থলে বিশাল জমিদারির উদ্ভব ঘটে এবং ছোট ভূস্বামীদেরকে জমিদারদের উপর নির্ভরশীল তালুকদারের মর্যাদায় অবনমিত করা হয়। কারণ 'রাজা' 'মহারাজা' নামে পরিচিত এ বড় জমিদারদের মাধ্যমেই তাদেরকে সরকারের নিকট খাজনা জমা দিতে হতো। অবশ্য বহু পুরনো তালুকদার সরাসরি সরকারের নিকট খাজনা জমা দিতেন। বড় জমিদারগণ নিজেরাই বিভিন্ন নামে ভিন্ন ভিন্ন পরিধির অনেক তালুক সৃষ্টি করেন যেমন, জঙ্গলবাড়ি তালুক, মাজকুরি তালুক, শিকিমি তালুক ইত্যাদি। একদিকে জমিদারি পরিচালনার কৌশল ও সুবিধা এবং অন্যদিকে বিশেষ উদ্দেশ্যে জমিদারি তহবিল গঠনের রাজস্ব নীতি হিসেবে এ তালুকগুলি সৃষ্টি করা হতো। কার্যত এটি ছিল নির্ভরশীল তালুক সৃষ্টির নামে জমি বিক্রয়। চিরস্থায়ী বন্দোবত-এর বিধান অনুযায়ী এ ধরনের আশ্রিত সকল তালুক সংশ্লিষ্ট জমিদারি থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং এগুলি স্বাধীনভাবে খাজনা প্রদানকারী জমিদারি হিসেবে বিবেচিত হয়। বিভিন্ন নামে আখ্যাত সব কয়টি স্বাধীন ও নির্ভরশীল তালুক স্বাধীন জমিদারিতে রূপান্তরিত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর জমিদারগণ নতুন ধরনের তালুক সৃষ্টি করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের চাপে অনেক জমিদার বিভিন্ন নামে নির্ভরশীল তালুক সৃষ্টি করতে থাকেন। এগুলি হচ্ছে পত্তনি তালুক, নোয়াবাদ তালুক, ওসাৎ তালুক। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে নির্ধারিত অধিকার ও দায়বদ্ধতার অনুরূপ এসব তালুকদারদেরও জমি ভোগ-দখলের মধ্যস্বত্বীয় অধিকার ছিল। তালুকদারদের খাজনা স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট করা ছিল এবং জমিদারদের সালামি প্রদানের মাধ্যমে তালুকদারি হস্তান্তরযোগ্য ছিল। এ অধীনস্থ তালুকগুলি কোনো স্পষ্ট আইনগত ভিত্তি ছাড়াই গড়ে উঠত। ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন এ ভোগদখলকারীদের নিয়মিত মধ্যবর্তী তালুকদার হিসেবে স্বীকার করে নেয় এবং এ আইনে তাদের অধিকার ও দায়িত্ব ব্যাখ্যা করা হয়। ১৯৫০ সালের ইস্ট বেঙ্গল এস্টেট অ্যাকুইজিশন অ্যাক্ট এর বলে ক্ষতিপূরণ প্রদানের মাধ্যমে সকল তালুকের বিলুপ্তি ঘোষণা করা হয়েছিল।

ফ্লাউড কমিশন

ফ্লাউড কমিশন ১৯৩৮ সালে বঙ্গীয় সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভূমি রাজস্ব কমিশন। নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি (১৯২৯ সালে প্রতিষ্ঠিত) এবং পরবর্তী সময়ে কৃষক প্রজা পার্টির (১৯৩৫ সালে প্রতিষ্ঠিত) নেতা এ.কে ফজলুল হক জমিদারি প্রথা বাতিল করতে এবং কৃষকদের ভূমিস্বত্ব পুনরুদ্ধারে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন। ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে এটাই ছিল কৃষক প্রজা পার্টির নির্বাচনী ইশতেহারের প্রধান প্রতিশ্রুতি। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয় দলই কৃষকদের প্রতি গভীর সহানুভূতিশীল ছিল। এ সহানুভূতির মূলে নিহিত ছিল রাজনৈতিক কারণ। কৃষকরা ভোটারদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে তাদের ভোটই ছিল ফলাফল নির্ধারক।

নির্বাচনের পর এ.কে ফজলুল হক মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস ব্যতিরেকে অন্যান্য সংসদীয় দলের সমর্থন নিয়ে একটি কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা বিলুপ্ত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তাঁর ওপর চাপ প্রয়োগ করা হয়। এ উদ্দেশ্যে স্যার ফ্রান্সিস ফ্লাউড-এর নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠিত হয়। কমিশনের বিচার্য ছিল ভূমি রাজস্ব প্রশাসন সংক্রান্ত সমস্যাবলির সমাধান বিশেষত জমিদারি প্রথা বাতিল সংক্রান্ত বিষয় বিবেচনা করা। ১৯৪০ সালের ২ মার্চ কমিশনের সুপারিশমালা পেশ করা হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা বাতিল এবং ভূমি নিয়ন্ত্রণে সকল মধ্যবর্তী স্বত্ব বিলোপ সাধন উক্ত সুপারিশমালার অন্তর্ভুক্ত ছিল। লক্ষ করা যায় যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের সময় থেকে ভূমি নিয়ন্ত্রণে যে পরিবর্তন ঘটে নতুন পরিস্থিতিতে তা অনুপযোগী ও ক্ষতিকর ব্যবস্থায় পরিণত হয়। এ সুপারিশগুলি ১৯৪৪ সালের প্রশাসনিক তদন্ত কমিটির জোরালো সমর্থন লাভ করে। কিন্তু ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশমালা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার খুব বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে নি। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, ১৯৪৩ সালের মহাদুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা এবং ভারত বিভাগের রাজনীতি প্রভৃতি ছিল এর প্রধান অন্তরায়। এসব সীমাবদ্ধতার কারণে ফজলুল হক, খাজা নাজিমউদ্দীন ও সোহরাওয়ার্দী সরকারের আমলে ফ্লাউড কমিশন রিপোর্টের বাস্তবায়ন স্থগিত থাকে, যদিও সব কটি সরকারই জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহী ছিল। পূর্ববঙ্গ জমিদারি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এর আওতায় ১৯৫১ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটে।

পাটোয়ারী

পাটোয়ারী সুলতানী ও মুগল শাসনামলে ভূমি রাজস্ব সংক্রান্ত কাগজ বা দলিল সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত গ্রাম পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা। জমি চাষের নির্ভুল রেকর্ড, কৃষকের দখলি সম্পত্তির পরিমাণ, শষ্যের ধরণ এবং পরিশোধনীয় রাজস্ব ইত্যাদি যা সরকারের রাজস্ব প্রশাসনের জন্য অপরিহার্য, প্রভৃতি বিবরণ তাঁর বহি বা রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ থাকত। আলাউদ্দীন খলজী এ পদের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিলেন। শেরশাহ এবং আকবর এর রাজত্বকালে এ পদটি প্রচলিত ছিল। সরকারের এই সাধারণ কর্মচারি রাজস্ব সংক্রান্ত অন্যান্য কাগজপত্র ছাড়াও গ্রামের প্রত্যেক কৃষক কর্তৃক জমাকৃত অর্থের হিসাবও সংরক্ষণ করতেন। কোনো প্রকার অভিযোগ থাকলে দায়িত্বশীল কর্মকর্তা পাটোয়ারীকে বরখাস্ত করতে পারতেন এবং তাঁর কাগজপত্র পরীক্ষা এবং তা রক্ষিত রেকর্ডের সঙ্গে তুলনা করে দেখার জন্য একজন বড়-মাদনবিশকে নিয়োগ দিতেন।

কর্নওয়ালিশ কোড এর অধীনে পাটোয়ারীর দফতর বিলুপ্ত করা হয়। গ্রামীণ সমাজে পাটোয়ারী বেশ প্রভাবশালী ছিলেন।

থাকবস্ত জরিপ

থাকবস্ত জরিপ মৌজার (গ্রামরূপেও অভিহিত) সীমানা নির্দেশকরণ এবং বাংলার গ্রামীণ সম্পদ নিরূপণের উদ্দেশ্যে ১৮৪৫-১৮৭৭ সালে পরিচালনা করা হয়। 'থাক' ফারসি শব্দ, এর অর্থ সীমানা নির্দেশক স্তম্ভ। এ জরিপের আগে বাংলার মৌজাগুলির কোনো নির্ভুল বিধিসম্মত সীমানা ছিল না। তখন পর্যন্ত নালা বা খাঁড়ি, প্রাচীন বৃক্ষ, নদী, বিল, জঙ্গল, রাস্তা, অন্যান্য মৌজা ইত্যাদির মতো প্রাকৃতিক চিহ্ন দিয়ে মৌজার সীমানা নির্দেশ করা হতো। অতীতে জনসংখ্যা কম হওয়ায় এবং মানুষ ও জমির অনুপাত মানুষের অনুকূলে থাকায় এ ধরনের পদ্ধতি ভালভাবেই কাজ করছিল। কিন্তু উনিশ শতকের শেষ দিকে জমির উপর চাপ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেলে এধরনের ব্যবস্থায় প্রায়ই সীমানা-বিরোধ ও মামলা-মোকদ্দমার সৃষ্টি হতো। তাছাড়া তখন পর্যন্ত শুধু প্রথা ও অতীতের লিখিত বিবরণের উপর ভিত্তি করে খাজনা ধার্য করা হতো। জমিদারির প্রকৃত সম্পদ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে কোনোদিনই কোনো জরিপ করা হয়নি। সুতরাং গ্রামের সম্পদ সম্পর্কে অধিকতর নিশ্চিতভাবে অবগত হওয়া প্রশাসনিক ও রাজস্ব উভয় বিবেচনায় ওপনিবেশিক সরকারের জন্য ছিল অপরিহার্য। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে থাকবস্ত বন্দোবস্তের সাফল্য কর্তৃপক্ষকে বাংলার জেলাগুলিতেও এ জরিপ চালাতে উৎসাহিত করে। ১৮৪৫ সালে এ কার্যক্রম শুরু হয়ে ১৮৭৭ সালে শেষ হয়। এ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ছিল মৌজা ও মৌজার অন্তর্ভুক্ত জমিদারির সীমানা নির্ধারণ, ভূমি ও অন্যান্য সম্পদ নিরূপণ, ভূমির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শ্রেণি চিহ্নিতকরণ, বিজ্ঞানসম্মত ভূচিত্র অঙ্কন করে সকল মৌজা, পরগণা ও জেলার ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক রেখাচিত্র প্রস্ত্তত করা। মৌজা ছিল থাক-জরিপের একক। জরিপকৃত কোনো কোনো জেলার প্রতিটি গ্রামের একটি খসড়া ভূচিত্র তৈরি করে তাতে গ্রামের জমিদারি, বসতবাটি, মাঠ, উৎপাদিত শস্য, জনসংখ্যা এবং প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করা হয়। নির্দেশক হিসেবে প্রতিটি গ্রামকেই একটি থাক-নম্বর দেওয়া হয়। থাক জরিপে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে পরবর্তী রাজস্ব জরিপ পরিচালিত হয়।

দীউয়ানি

দীউয়ানি মুগল যুগের প্রাদেশিক রাজস্ব শাসন পদ্ধতি এবং বাংলায় কোম্পানি শাসন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে গৃহীত একটি প্রাথমিক কৌশল। মুগল প্রাদেশিক প্রশাসনের দুটি প্রধান শাখা ছিল নিজামত ও দীউয়ানি। ব্যাপক অর্থে নিজামত হচ্ছে সাধারণ প্রশাসন এবং দীউয়ানি হচ্ছে রাজস্ব প্রশাসন। প্রাদেশিক সুবাহদার ছিলেন নিজামতের প্রধান (এ জন্য তাকে নাজিমও বলা হতো) এবং দীউয়ান ছিলেন সাধারণ প্রশাসনের, বিশেষ করে রাজস্ব প্রশাসনের প্রধান। সুবাহ প্রশাসনের ক্ষমতায় ভারসাম্য রক্ষা করার প্রয়োজনে মুগল সম্রাটগণ এ দুই প্রধান কর্মকর্তাকে সরাসরি নিয়োগ দান করতেন। তারা সাধারণত সম্রাট কর্তৃক সরাসরি নিয়োজিত হতেন এবং সম্রাটের নিকট দায়বদ্ধ থাকতেন। নাজিমের সঙ্গে কোনো ধরনের যোগাযোগ না করেই কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট রাজস্ব প্রেরণের ক্ষমতা ও দায়িত্ব ছিল দীউয়ানের। রাজস্ব প্রেরণের ব্যাপারে সুবাহদার আজিম-উস-শান ও দীউয়ান মুর্শিদকুলী খান এর মধ্যকার দ্বন্দ্ব মুগল শাসনযুগে দীউয়ানি প্রতিষ্ঠানটির বাস্তব অবস্থার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কিন্তু ভারসাম্য সৃষ্টির লক্ষ্যে নাজিম ও দীউয়ানের মধ্যে এ ক্ষমতা পৃথকীকরণের পদ্ধতিটি নওয়াবি যুগে আর দেখা যায়নি। স্বাধীন নওয়াবি যুগে দীউয়ান এর সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগির প্রয়োজন ছিল না। ক্ষমতা সংকুচিত হয়ে দীউয়ানরা তখন নওয়াব কর্তৃক নিয়োগ লাভ করতেন এবং তাঁর নিকটই দায়বদ্ধ থাকতেন। এটি মুগল সাম্রাজ্যের শাসননীতির লঙ্ঘন ছিল, কিন্তু নওয়াবদের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি করার জন্য কেন্দ্রের দুর্বল ও প্রায় নিঃস্ব সম্রাটের পক্ষে সরাসরি দীউয়ান নিয়োগ দান করা সম্ভব হয় নি। তবে অচল সাম্রাজ্যিক ব্যবস্থায়ও দীউয়ান পদটির অস্তিত্ব বজায় ছিল।

বাংলার সক্রিয় বণিক হিসেবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়োগকৃত দীউয়ানদের স্বাধীন ক্ষমতার দিনগুলিতে তাদের দাপট দেখেছে এবং সে সময় একজন দীউয়ানের নিয়োগের সময় তাঁর আনুকূল্য লাভের আশায় তাঁকে নজরানা প্রদান করেছে। তারা এটিও বুঝতে পেরেছিল যে, কেন্দ্রের দুর্বলতার কারণে স্বাধীন নওয়াবরা দীউয়ানির এ পদ্ধতিকে বিলুপ্ত করবে। রবার্ট ক্লাইভ কোম্পানির কার্যক্রমের নেতৃত্ব নিয়ে ১৭৬৫ সালে দ্বিতীয়বারের মতো বাংলায় আসেন। তিনি সমকালীন পরিস্থিতির ভেতর থেকে সুবিধা আদায়ের জন্য আশ্রয়হীন সম্রাট শাহ আলমএর সঙ্গে এলাহাবাদে সাক্ষাৎ করেন এবং দুর্দশাগ্রস্ত সম্রাটকে কেন্দ্রীয়ভাবে দীউয়ান নিয়োগের রীতিটি পুনরায় চালু করার প্রস্তাব দেন ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দীউয়ান নিযুক্ত করার জন্য প্রলুব্ধ করেন। তিনি সম্রাটকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, পূর্বে দীউয়ানগণ যেমন নির্দিষ্ট হারে রাজস্ব প্রদান করতেন কোম্পানিও তেমনি সম্রাটকে নিয়মিত নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব প্রেরণ করবে।

বাংলা থেকে বহুকাল যাবৎ রাজস্ব না পাওয়ায় সম্রাট শাহ আলম ক্লাইভের প্রস্তাবে সম্মত হন। ফলে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ফরমান এর (১২ আগস্ট ১৭৬৫) মাধ্যমে সম্রাট কোম্পানিকে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দীউয়ান নিযুক্ত করেন। শর্ত থাকে যে, কোম্পানি বার্ষিক ছাবিবশ লক্ষ রুপি সম্রাটকে রাজস্ব হিসেবে প্রদান করবে। সুবাহর অপ্রাপ্তবয়স্ক নওয়াব নাজমুদ্দৌলার সঙ্গে কোম্পানি আরেকটি চুক্তি স্বাক্ষর করে (৩০ সেপ্টেম্বর ১৭৬৫)। এতে বলা হয়, কোম্পানি নিজামত প্রশাসন পরিচালনা ও নওয়াব পরিবারের ব্যয় নির্বাহের জন্য বার্ষিক তেপ্পান্ন লক্ষ রুপি প্রদান করবে। সুবাহ থেকে সংগৃহীত রাজস্বের ভেতর থেকেই এ সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করা হবে এবং নওয়াব ও সম্রাটকে প্রতিশ্রুত অর্থ দেওয়ার পর উদ্‌বৃত্ত অর্থ কোম্পানির লাভ হিসেবে বিবেচিত হবে।

ক্লাইভ কোম্পানিকে সরাসরি শাসকে পরিণত করতে চান নি। বেশ কিছু বাস্তব কারণে তিনি স্থানীয় এজেন্সিগুলির মাধ্যমে দীউয়ানি প্রশাসন পরিচালনা করতে চেয়েছিলেন। তিনি সৈয়দ মুহম্মদ রেজা খানকে নায়েব দীউয়ান এবং নায়েব নাজিম পদে নিয়োগ দান করেন। নায়েব নাজিম হিসেবে তিনি নওয়াবের প্রতিনিধিত্ব করতেন এবং নায়েব দীউয়ান হিসেবে কোম্পানির প্রতিনিধিত্ব করতেন। এভাবে তিনি যে পদ্ধতির প্রবর্তন করলেন তা দ্বৈতশাসন নামে পরিচিত হয়। যে পর্যন্ত ফোর্ট উইলিয়ম এর গভর্নর হিসেবে ক্লাইভ সমর্থন দিয়েছিলেন সে পর্যন্ত রেজা খান বেশ সাফল্যের সঙ্গে দ্বৈতশাসন পরিচালনা করেছিলেন। ১৭৬৭ সালে ক্লাইভ চূড়ান্তভাবে বিদায় নেয়ার পর রেজা খানের প্রভাব স্তিমিত হয়ে যায়। ব্যক্তিগত ব্যবসার নামে কোম্পানির কর্মচারীরা সারা দেশে লুণ্ঠন শুরু করে। এরই প্রতিক্রিয়ায় দেশের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ে এবং তা ১৭৬৯-৭০ খিস্টাব্দের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ডেকে আনে।

সম্ভাব্য ধ্বংস থেকে এ নতুন রাজ্যকে এবং নানাবিধ ক্ষতির কারণে চূড়ান্তভাবে ধ্বংস হওয়ার হাত থেকে কোম্পানিকে রক্ষার জন্য কোর্ট অব ডাইরেক্টর্স ১৭৭২ খিস্টাব্দ দীউয়ানি দায়িত্ব সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংসকে ক্লাইভের পদ্ধতিসমূহ বিলুপ্ত করার পরামর্শ

দেয়। হেস্টিংস রেজা খানকে চাকুরিচ্যুত করেন এবং দীউয়ানি প্রশাসন সরাসরি নিজে গ্রহণ করেন। এভাবেই ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশিক রাজ্যের দ্বিতীয় পর্বের যাত্রা শুরু হয়।

রাজস্ব বোর্ড

রাজস্ব বোর্ড কোম্পানি আমলে রাষ্ট্রীয় কার্যাদির দাপ্তরিক বিভাজনের পূর্বে মূলত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামোতে গঠিত রাজস্ব ব্যবস্থাপনার শীর্ষ প্রশাসনিক সংস্থা। ব্রিটিশ শাসনের সমাপ্তি পর্যন্ত ঔপনিবেশিক সরকারের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রশাসনিক অঙ্গ রাজস্ব বোর্ড তার প্রশাসনিক কাঠামো, আওতা, ক্ষমতা এবং কার্যক্রমে ধাপে ধাপে অনেক সংস্কার সাধন করে। ১৭৭০ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক কলকাতার রাজস্ব পরিষদ এবং পাটনার রাজস্ব পরিষদ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ঔপনিবেশিক সরকারের রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়। সমন্বয়ের জন্য কলকাতায় রাজস্ব বোর্ড প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করা হয়। কেন্দ্রীয়ভাবে রাজস্ব নির্ধারণ, নিয়ন্ত্রণ ও সংগ্রহের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত ১৭৭০ সালের ব্যবস্থাটি ১৭৭৩ সালে রহিত করা হয়। রাজস্ব বোর্ড এবং জেলা কালেক্টরেট প্রশাসন দুটি ব্যবস্থাই বিলোপ করা হয়। এর পরিবর্তে দেশকে প্রাদেশিক পরিষদ কর্তৃক শাসিত ছয়টি প্রদেশে ভাগ করা হয়। ১৭৮৬ সাল পর্যন্ত গভর্নর জেনারেলের সভাপতিত্বে গঠিত রাজস্ব কমিটি নামে পরিচিত একটি কেন্দ্রীয় দপ্তর কর্তৃক তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। গভর্নর জেনারেল পরিষদের সদস্যরা এই কমিটির সদস্য ছিলেন। অন্য কথায়, গভর্নর জেনারেল পরিষদই ছিল নতুন রাষ্ট্রের রাজস্ব কার্যাবলি পরিচালনার রাজস্ব কমিটি।

ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকালে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ব্যাপক প্রসার লাভ করে এবং অনেক প্রশাসনিক জটিলতার সম্মুখীন হয়। ১৭৮৫ সালে রাজস্ব কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। সমগ্র দেশকে অনেকগুলি জেলায় ভাগ করা হয় এবং প্রতি জেলায় একজন করে ইউরোপীয় কালেক্টর নিয়োগ দেওয়া হয়। ১৭৮৬ সালে রাজস্ব কমিটিকে রাজস্ব বোর্ড নাম দেওয়া হয়। পুনর্গঠিত রাজস্ব বোর্ড সভাপতিসহ ৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। গভর্নর জেনারেলের পরিবর্তে গভর্নর জেনারেল পরিষদের একজন কনিষ্ঠ সদস্য এর সভাপতি নিযুক্ত হন। এভাবে উইলিয়ম কাউপার নামে একজন পরিষদ সদস্য রাজস্ব বোর্ডের প্রথম সভাপতি নিযুক্ত হন। এর অন্য চারজন সদস্যের প্রত্যেকেই ছিলেন বেসামরিক নাগরিক। এভাবে রাজস্ব বোর্ড গভর্নর জেনারেল পরিষদ থেকে সাংবিধানিকভাবে বিযুক্ত হয়ে যায় এবং নির্বাহী বিভাগের অধীনে একটি পৃথক প্রশাসনিক সংস্থা হিসেবে আবির্ভূত হয়। রাজস্ব বোর্ডে একজন মহা-হিসাবনিরীক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয় যিনি ছিলেন যুগপৎ বোর্ডের সচিব এবং আর্থিক বিষয়াদির তত্ত্বাবধায়ক।

সাধারণভাবে কর্নওয়ালিস কোড নামে পরিচিত ১৭৯৩ সালের বিধিমালা অনুযায়ী রাজস্ব বোর্ডের গঠনতন্ত্র আরও সংশোধন করা হয়। গভর্নর জেনারেল পরিষদের সদস্যকে রাজস্ব বোর্ডের সভাপতি নিয়োগের বিধান বিলোপ করে এটিকে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করা হয় এবং একজন জ্যেষ্ঠ সরকারি কর্মকর্তাকে এর প্রধান করা হয়। ১৭৯৩ সালের ব্যবস্থাটি রাজস্ব বোর্ডকে জেলা কালেক্টরের নিযুক্তি, বদলি, এবং সাধারণ কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষমতা প্রদান করে। রাজস্ব বোর্ডের যেকোন কর্মকর্তাকে তার আচরণ ব্যাখ্যা ও যৌক্তিকতা প্রদর্শনের জন্য সদর দপ্তরে ডেকে পাঠানো, অনূর্ধ্ব এক মাসের বেতনের সমপরিমাণ জরিমানা আরোপ এবং দপ্তর থেকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করার ক্ষমতা ছিল। সাধারণভাবে, সমগ্র বেসামরিক প্রশাসন এবং বিশেষভাবে রাজস্ব প্রশাসন রাজস্ব বোর্ডের হাতে ন্যস্ত করা হয়। রাজস্ব বোর্ড অভিভাবক আদালত হিসেবে কাজ করত যা শিশুদের কল্যাণ এবং আইনের মাধ্যমে আইনগতভাবে অনুপযুক্ত অন্যান্য জমিমালিকদের বিষয়াবলি দেখাশুনা করত।

১৮২২ সাল পর্যন্ত রাজস্ব বোর্ডের আওতা সমগ্র বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে বিস্তৃত করা হয়। এর পূর্বপর্যন্ত রাজস্ব বোর্ড গভর্নর জেনারেল পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত সীমাহীন ক্ষমতাসম্পন্ন সর্বোচ্চ প্রশাসনিক অঙ্গ হিসেবে কাজ করে আসছিল। ১৮০০ সাল থেকে সাম্রাজ্যের দ্রুত সম্প্রসারণ ও কাজকর্মের বিস্তৃতির ফলে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের প্রশাসনিক দক্ষতা ঠিক রাখার উদ্দেশ্যে বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো এবং আওতাকে পুনর্গঠন করার প্রয়োজন দেখা দেয়। রাজস্ব বোর্ডের আওতা হ্রাস করা হয়। ১৮২২ সালের বিধান অনুযায়ী পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহ ও কেন্দ্রীয় বাংলার ওপর থেকে বোর্ডের নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া হয় এবং এ দুটি এলাকার জন্য দুটি অতিরিক্ত বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়। এরপর মূল রাজস্ব বোর্ড সীমানাগতভাবে কেবল বদ্বীপ বা বাংলার নিম্নাঞ্চল (পূর্ববাংলা) নিয়েই সীমিত থাকে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে, ১৮২৯ সালের বিধিমালা অনুযায়ী রাজস্ব বোর্ডের একটি বড় ধরনের পুনর্গঠন হয়। উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের প্রশাসন লক্ষ্য করে যে, বোর্ড বিচারসংক্রান্ত ও রাজস্ব প্রশাসনের কাজে ভারাক্রান্ত এবং জেলা কর্তৃপক্ষকে বর্ধিত দায়িত্ব দিয়ে রাজস্ব প্রশাসনের কেন্দ্রীয় কাঠামোর পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। রাজস্ব বোর্ড এবং জেলা কালেক্টরদের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃপক্ষের একটি নতুন স্তর তৈরি করা হয়। বাংলাকে ১১টি বিভাগে বিভক্ত করা হয় ও প্রতিটিকে একজন বিভাগীয় কমিশনারের অধীনস্থ করা হয়। অতঃপর জেলা কালেক্টরদের সরাসরি বিভাগীয় কমিশনারের তত্ত্বাবধানে এবং বিভাগীয় কমিশনারদের রাজস্ব বোর্ডের অধীনে ন্যস্ত করা হয়।

এই শাসনের অধীনে বিভাগীয়করণের নীতিমালার আওতায় প্রশাসন পুনর্গঠন করা হয়। ১৮৬১ সালের বিভাগীয় পুনর্গঠন অনুযায়ী বোর্ডের বহু ক্ষমতা ও দায়িত্ব বিভিন্ন কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয় দপ্তরের অধীনে ন্যস্ত হয়। এভাবে ১৮৮৯ সালে বোর্ড দুইজন সচিব নিয়ে একটি দুই সদস্যবিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানে অবনমিত হয়। সদস্য দুজন পৃথকভাবে বোর্ডের সকল ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন। একজন সাধারণ রাজস্বের বিষয়ে এবং অপরজন আপিল, স্ট্যাম্প আবগারি শুল্কের মতো বিবিধ রাজস্ব ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দ, সরকারি কাজের পদ্ধতি ও পরিচালনার ক্ষেত্রে সাধারণ ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। এরপরও কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধান, সিদ্ধান্ত ও আদেশের পুনর্বিবেচনা, জেলা কালেক্টরদের নিষ্পত্তিমূলক নির্দেশমূহের অনুমোদন, বকেয়া রাজস্বের নিয়ন্ত্রণ, ভূমি রেজিস্ট্রারের নিয়ন্ত্রণ, অভিবাসন, কর ও রাজস্ব, বাঁধ, লবণ, আফিম, আবগারি, অভিভাবক আদালত, স্ট্যাম্প ও অন্যান্য অনেক বিষয়ে বোর্ড বিপুল ক্ষমতার অধিকারী রয়ে যায়।

পুনঃএকীভূত বাংলাকে ১৯১২ সালে বোম্বে এবং মাদ্রাজের মতো একটি নির্বাহী পরিষদসহ গভর্নরের শাসনাধীন প্রদেশ করা হয়। বোর্ড কর্তৃক প্রযুক্ত পূর্বের নির্বাহী ক্ষমতার অনেকগুলি গভর্নরের পরিষদ এবং সচিবালয়ের আওতাভুক্ত করা হয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে গভর্নরের পরিষদ ইন্ডিয়া কাউন্সিলকে রাজস্ব বোর্ডের সম্পূর্ণ বিলুপ্তির সুপারিশ করে। কিন্তু একে সম্পূর্ণ বিলোপ করার পরিবর্তে ভারত সরকারের মুখ্য সচিব একজন সচিবের অধীনে বোর্ডকে এক সদস্যবিশিষ্ট সংস্থায় পরিণত করার জন্য বেঙ্গল কাউন্সিলকে নির্দেশ দেয়। এভাবে ১৯১৩ সাল থেকে রাজস্ব বোর্ড সচিব হিসেবে একজন কনিষ্ঠ বেসামরিক কর্মকর্তা নিয়ে এক সদস্যবিশিষ্ট বোর্ড হিসেবে কাজ করা শুরু করে। ১৯৪৭-এর পরেও বোর্ডের এই কাঠামোটি অপরিবর্তিত ছিল। ১৯৫০ সালের পূর্ববঙ্গ জমিদারি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের প্রবিধান অনুযায়ী ওয়ার্ড-জাতীয় সম্পত্তিসহ সকল ভূ-সম্পত্তির রাজস্ব-স্বার্থ অধিগ্রহণের সাথে ভূমি ও রাজস্ব-সংক্রান্ত অধিকাংশ পুরানো আইন বাতিল বা বিলোপ করা হয়। এতে রাজস্ব বোর্ড আবার তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। এই পরিস্থিতিতে ১৯৭৩ সালের এক রাষ্ট্রপতি আদেশবলে রাজস্ব বোর্ড বিলোপ করা হয় এবং এর অবশিষ্ট কার্যক্রম বিভাগীয় কমিশনার ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ওপর ন্যস্ত করা হয়।

ভূমি অধিগ্রহণ
ভূমি অধিগ্রহণ দেশের আইনের বিধান অনুযায়ী জনসাধারণের কল্যাণের লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক বেসরকারি জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া। বর্তমান বাংলাদেশের ভূখন্ডে এ ধরনের আদিতম বিধিবদ্ধ আইন হলো ১৮২৪ সালের ১ নং বঙ্গীয় প্রবিধান। লবণ উৎপাদন শিল্পে ব্রিটিশ বাণিজ্যস্বার্থ রক্ষায় এই আইন প্রণীত হয়। ১৮৫০ সালের ১নং আইন এই আইনের স্থলবর্তী হয় এবং জনপূর্ত কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণের বিধান করা হয়। ১৮৫০ সালের ৪২নং আইনবলে রেলপথ নির্মাণকে জনকল্যাণমুখী বলে ঘোষণা করা হয়। সরকার জমির হুকুমদখল এবং সড়ক, খাল ও রেলপথ নির্মাণে প্রয়োজনীয় মাটি সংগ্রহের জন্য জমির সাময়িক দখল গ্রহণের লক্ষ্যে সংক্ষিপ্ত ক্ষমতা গ্রহণ করে।
পরে জমি হুকুমদখল সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন একত্রিত ও সংহত করে ১৮৫৭ সালের ৬নং আইন পাশ করা হয়। এই আইন গোটা ব্রিটিশ ভারতে প্রয়োগযোগ্য করা হয়। সেচ, নৌপরিবহণ, ডক ও পোতাশ্রয় উন্নয়নের উদ্দেশ্যে গভর্নর জেনারেল-ইন-কাউন্সিলকে কর্তৃত্ব প্রদানের জন্য ১৮৬৩ সালের ২২নং আইন শিরোনামে এক নতুন আইন পাশ হয়। এই আইনের আওতায় গভর্নর জেনারেল-ইন-কাউন্সিল এ ধরনের কাজগুলিকে জন উপযোগমূলক কাজ (public utility) হিসেবে ঘোষণার ক্ষমতা লাভ করেন। সম্পর্কিত আইনগুলির সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংহতকরণ প্রক্রিয়া ১৮৭০ সাল অবধি অব্যাহত থাকে। ১৮৭০ সালে ১০নং আইন পাশ হয়।
১৮৭০ সালের আগে ভূমি অধিগ্রহণ আইনের সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, কালেক্টর ও জমির মালিকের মধ্যে যে জমি হুকুমদখলের প্রস্তাব করা হয়েছে সে জমির মূল্য সম্পর্কে ঐকমত্য না হলে বিষয়টি পুরোপুরি সালিশদারদের এখতিয়ারাধীনে চলে যাবে। তারা যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবেন তার বিরুদ্ধে কোন আপিল করা যাবে না। এ ব্যবস্থায় সরকারি অর্থের পরিতাপজনক অপচয় ঘটে। কেননা, প্রায়ই দেখা যায়, সালিশদারগণ তাদের কাজে যোগ্য নন। তারা দুর্নীতিগ্রস্তও বটে। আইনের এই গলদ ১৮৭০ সালের ১০ নং আইনে দূরীভূত হয়। এ আইনে সালিশির ব্যবস্থাও তুলে দেওয়া হয়। স্থির হয়, কালেক্টর ও জমির মালিকের মধ্যে জমির মূল্যের বিষয়ে মতপার্থক্য হলে বিষয়টি সিদ্ধান্তের জন্য দেওয়ানি আদালতে পাঠানো হবে। দেওয়ানি আদালতের বিচারক দুই সালিশদারের মধ্যে অন্তত একজনের সঙ্গে একমত হতে পারলে তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন। আবার দুই সালিশদারের সাথেই বিচারক দ্বিমত পোষণ করলে সেক্ষেত্রে সাধারণত হাইকোর্টে আপিলের অনুমতি দেওয়া হতো। এ কারণে একাধিক মামলা হতো, নিষ্পত্তিতে বিলম্ব ও ব্যয়বাহুল্য ঘটত। আইনটি এ কারণে পুরোপুরি ফলদায়ক না হওয়ায় ১৮৯৪-এর আইনে বাতিল হয়ে যায়।
নিয়মিত কোন মামলায় দেওয়ানি আদালতের ডিক্রিতে পরিবর্তন না হলে, ১৮৯৪ সালের আইন কালেক্টরের ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্ত হিসেবে স্থির করে দেয়। এই আইনের উদ্দেশ্য, জমির হুকুমদখলের ক্ষেত্রে দ্রুততর ক্ষতিপূরণ নিরূপণের একটি পদ্ধতির ব্যবস্থা করা। এই সর্বাঙ্গীণ প্রকৃতির আইনের আওতায় জরুরি পরিস্থিতির জন্য ব্যবস্থা ছিল। ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত না দিয়ে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে কালেক্টরকে কোন জমির দখল নেওয়ার কৃতিত্বাধিকার দেওয়া হয় নি। তবে আইনের ১৭ ধারার আওতায় ১৫ দিনের নোটিশের মেয়াদশেষে, এমনকি, জমির ক্ষতিপূরণ স্থির করার আগেও জমির দখল গ্রহণের ক্ষমতা

কালেক্টরকে দেওয়া হয়েছে। তবে অসুবিধা কমানোর জন্য সাময়িক প্রাক্কলনের (estimate) ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ পরিশোধের বিষয়টিকে কালেক্টরের জন্য আইনগত বাধ্যবাধকতা করা হয়েছে। এই সাময়িক প্রাক্কলন হবে যথাক্রমে, ক. নির্মিত কাঠামো ও ভবনের ১০%; খ. বাড়ি, চালাঘর/ছাউনি ও ফলের বাগানের ৭৫%; গ. খালি নাল জমির ৫০%। এই আইনে রাস্তাঘাট ও বাঁধ মেরামতে মাটি সরানোর/স্থানান্তর করার জন্য জমির সাময়িক দখল গ্রহণের বিধান রাখা হলেও বাড়িঘর ও ভবনের অধিযাচিত দখল গ্রহণের কোন বিধান নেই।

১৮৯৪ সালের ১ নং আইনের আওতায় ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের বেলায় কালেক্টরের কাজ হলো তার মতে জমির মূল্য কত হতে পারে সেই অঙ্ক নির্ধারণ করা। এই ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের কার্যপ্রক্রিয়াগুলি বিচার বিভাগীয় কিছু নয় বরং তা প্রশাসনিক। আর এক্ষেত্রে কালেক্টরের প্রদত্ত সিদ্ধান্ত আদালত কর্তৃক পুনর্বিবেচনাযোগ্য। এ সম্পর্কিত বিরোধে সিদ্ধান্তের জন্য জমির মালিকের বিষয়টি আদালতে উত্থাপনের অধিকার ছিল। এটি অবশ্য বুঝে নিতে হবে, জমির সঠিক মূল্যায়ন নির্ধারণ করা এক অসম্ভব কাজ, বড়জোর এর একটা কাছাকাছি বাজারমূল্যে উপনীত হওয়া যায়। এজন্য গাণিতিক নির্ভুলতায় জমির ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ সম্ভব নয়। জমির ক্ষতিপূরণ নিরূপণ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কাজ করার সময় যেসব বিষয় অবশ্য বিবেচ্য এই আইনে কেবল সেগুলিরই বিধান রয়েছে।

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর গোটা পূর্ববাংলা প্রদেশব্যাপী বহুসংখ্যক সরকারি দপ্তরের স্থান সঙ্কুলান ও সরকারি কর্মচারীদের আবাসিক চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত মেয়াদের জন্য ১৪ জুলাই, ১৯৪৭-এ পূর্ববঙ্গীয় জরুরি সম্পত্তি অধিযাচিত দখল অধ্যাদেশ জারি করা হয়। তারপরও তীব্র আবাসিক সংকট অব্যাহত থাকে। নতুন এই প্রদেশটির জন্য নতুন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প সরবরাহ ও নানা ধরনের সেবার জন্য দ্রুত ও জোরদার উন্নয়ন প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। এ পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য ‘(জরুরি) সম্পত্তি অধিযাচিত দখল আইন, ১৯৪৮’ শিরোনামে এই আইন পাস করা হয়। এই আইনে স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তির আশু অধিযাচিত দখল গ্রহণের জন্য এক সংক্ষিপ্ত কর্মপদ্ধতির বিধান রাখা হয়। এই কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মালিকানা কিংবা ঐ সম্পত্তির দখলদার পক্ষের ওপর ডেপুটি কমিশনার কেবল বিজ্ঞপ্তি জারি করে কাজটি করতে পারতেন। এ আইনে সম্পত্তির দখল গ্রহণের জন্য দুই স্তরের ব্যবস্থা ছিল। এই দ্বি-স্তর ব্যবস্থায় প্রথমে অনতিবিলম্বে জমির দখল গ্রহণের জন্য অধিযাচন করা হতো ও তারপর স্থায়ী দখলের জন্য কার্যব্যবস্থা অনুসৃত হতো। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কষ্ট লাঘবের উদ্দেশ্যে ১৯৪৭-এর অধ্যাদেশের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি রেখে দিয়ে এই নতুন আইনে সেগুলির আরও উন্নতি সাধন করা হয়। সম্পত্তি/ভূমির স্থায়ী দখল গ্রহণের বিষয়টি সরকারের সিদ্ধান্তের ব্যাপার হলেও ডেপুটি কমিশনার সরকারের পরবর্তী অনুমোদন সাপেক্ষে যে কোন সম্পত্তি অধিযাচন করার পর তা দখলে নিতে ও স্থায়ী অধিগ্রহণ করতে পারতেন।

এই আইনের আওতায় প্রদত্ত কোন আদেশ বা গৃহীত কোন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোন মামলা বা আবেদন গ্রহণ করার ব্যাপারে আদালতের এখতিয়ার রহিত করা হয়। এই আইনে বিচার এখতিয়ারের ওপর যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে তা অবশ্য প্রকৃত অর্থেই আদালতের এখতিয়ারের পরিপূর্ণ উৎখাত বোঝায় নি। বরং আদালত নিজে সত্যিকার অর্থেই তার এখতিয়ার থেকে উৎখাত হয়েছে কিনা আদালত নিজেই সে বিচার করার অধিকারী হয়েছে। কাজেই উল্লিখিত বাধা সত্ত্বেও এই আইনের আওতায় প্রদত্ত কোন আদেশ আইনে প্রদত্ত অধিকারের মধ্যে থেকে বা কোরাম নন জুডিস (coram non judice) কিংবা অসদুদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে কিনা সে

বিষয়টি স্থির করার এখতিয়ার আদালতের বজায় রয়েছে। আর তাই আদালত তেমন ক্ষেত্রে উল্লিখিত কারণগুলির ভিত্তিতে যে কোন বিশেষ আদেশ বাতিল করে দিতে পারে।

১৮৯৪ সালের ভূমি অধিগ্রহণ আইনটি অবশ্য ১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন পাশ হওয়ার পরেও বজায় রাখা হয়। তবে ক্বচিৎ এ আইনের প্রয়োগ করা হয়েছে। কারণ, দেখা যায়, ১৮৯৪ সালের আইনের আওতায় যে কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করতে হয় তা অধিযাচনাধীন সম্পত্তির জন্য মন্থর ও দীর্ঘসূত্রী এবং অধিযাচনাধীন সম্পত্তির আগে দখল গ্রহণ করে পরে তার স্থায়ী দখল গ্রহণের কার্যপদ্ধতির সূচনা করা ছিল সবসময়েই সুবিধাজনক।

ভূমি অধিগ্রহণের আইনটির আবার পুনর্বিবেচনা করার পর ১৯৮২ সালে তা সুসংহত করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল, ১৯৪৮ সালের সম্পর্কিত আইনে যে কঠোর কার্যপদ্ধতির ব্যবস্থাপত্র ছিল তার বিরুদ্ধে স্থাবর সম্পত্তির মালিককে যুক্তিসঙ্গত রক্ষাব্যবস্থা প্রদান করা। সেভাবেই ১৯৮২ সালের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও অধিযাচিত দখল অধ্যাদেশ (১৯৮২ সালের ১১ নং অধ্যাদেশ) জারি করা হয়। ১৮৯৪ সালের আইনটি বাতিল করা হয় ও বৈধতার নির্ধারিত মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ায় ১৯৪৮ সালের আইনটির স্বাভাবিক অবসান ঘটে।

১৯৮৮ সালের ভয়াবহ বন্যার পর বন্যা ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস নিয়ন্ত্রণ এবং নদীভাঙন নিবারণের স্থায়ী ব্যবস্থাদির জন্য স্থাবর সম্পত্তির দ্রুত দখল গ্রহণের প্রয়োজনে পাঁচ বছরের সাময়িক মেয়াদের জন্য জরুরি ভিত্তিতে সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সালের ৯ নং আইন) নামে এক নতুন আইন পাশ করা হয়। এই সাময়িক আইনকে অন্যান্য সকল আইনের ওপর নিরঙ্কুশ ধরনের আধিপত্য প্রদান করা হয়, যার অর্থ এই আইনের বিধানগুলি বলবৎ অন্য যে কোন আইনের পরিবর্তে বহাল হবে। এই আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ডেপুটি কমিশনার মালিকের ওপর নোটিশ জারি করে স্থাবর/অস্থাবর যে কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণের আদেশ দিতে পারেন। এই অধিগ্রহণ আদেশ চ্যালেঞ্জ করার অধিকার মালিককে দেওয়া হয় নি, তবে তিনি ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য ডেপুটি কমিশনারের কাছে ঐ সম্পত্তিতে তার স্বার্থের দাবি পেশ করতে পারেন। এই আইনের মেয়াদ ছিল ১৯৯৪ সাল অবধি। উক্ত মেয়াদান্তে আইনটির স্বাভাবিক অবসান ঘটেছে।

১৯৮২ সালের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও অধিযাচিত দখল অধ্যাদেশ (১৯৮২ সালের ১১ নং অধ্যাদেশ) বর্তমানে বাংলাদেশে (তিনটি পার্বত্য জেলা ছাড়া) জমির হুকুমদখলের ক্ষেত্রে একমাত্র আইনগত দলিল। এই আইনে সরকারি উদ্দেশ্যে ও জনস্বার্থে উপাসনাস্থল, গোরস্থান বা শ্মশানঘাট ছাড়া স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও অধিযাচন ভিত্তিতে দখল গ্রহণের বিধান রয়েছে। এতে বিস্তারিত কার্যপদ্ধতিরও বিবরণ রয়েছে যাতে ডেপুটি কমিশনার পদ্ধতিসম্মতভাবে ও সুষ্ঠু নীতিমালার ভিত্তিতে জমি দখলের কাজে অগ্রসর হতে পারেন আর জমি মালিকের জন্যও আপত্তি তোলার সুযোগ থাকে। যথাশুনানি গ্রহণ করে এসব আপত্তিরও অবশ্যই নিষ্পত্তি করতে হবে।

১৯৪৮ সালের আইনের আওতায় ভূমি হুকুমদখলের প্রতি ক্ষেত্রেই সরকারের অনুমোদন আবশ্যক, যদিও ডেপুটি কমিশনার তার অধিযাচন ক্ষমতার আওতায় সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির দখল গ্রহণ করতে পারেন ও এভাবে নিষ্পন্ন কার্য (fait accompli) হিসেবে আইনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার আগেই ঐ সম্পত্তি আলাদা করে নিতে (alienation) পারেন। এই নতুন আইনে হুকুমদখল গ্রহণাধীন জমির পরিমাণ ৫০ বিঘার (৬.৬৮৯ হেক্টর) অধিক না হলে ও জমির মালিকের তরফ থেকে আপত্তি না থাকলে হুকুমদখলের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার ডেপুটি কমিশনারের রয়েছে। আর যদি জমির মালিকের আপত্তি থাকে তাহলে এ বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনারের অনুমোদন আবশ্যক হবে।

আগের আইনে জমি হুকুমদখল প্রক্রিয়ায় বিলম্বের কারণে সিদ্ধান্ত প্রণয়নের বেলায় এই নতুন ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। জমি অধিগ্রহণে বিলম্বের ফলে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত হতো এবং দ্রুততর ভূমি অধিগ্রহণের বিষয়টির ওপর বিদেশি অর্থসংস্থানকারী প্রতিষ্ঠানগুলি চাপ সৃষ্টি করত। তাই জমি অধিগ্রহণের বেলায় যেভাবে সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয় তা হলে, জমি হুকুমদখলের প্রস্তাবিত পরিমাণ ৫০ বিঘা (৬.৭ হে.) পর্যন্ত হলেও হুকুমদখলে আপত্তি না উঠলে ৪৫ দিন এবং আপত্তি উঠলে ৭৫ দিন, জমি হুকুমদখলের প্রস্তাবিত পরিমাণ ৫০ বিঘার বেশি হলো ও হুকুম দখলে আপত্তি না উঠলে ১০৫ দিন এবং আপত্তি উঠলে ১৩৫ দিন।
সিদ্ধান্ত বা রায় চূড়ান্তকরণের জন্য অতিরিক্ত সর্বাধিক অনুমোদিত সময়সীমা ১১২ দিন। এভাবে, কোন হুকুমদখল মামলায় জমির পরিমাণ ৫০ বিঘা পর্যন্ত হলে এখন তা চূড়ান্ত করার সর্বাধিক সময়সীমা দাঁড়ায় ১৮৭ দিন আর জমির পরিমাণ ৫০ বিঘার বেশি হলে ২৭৪ দিন।
ডেপুটি কমিশনার এই অধ্যাদেশের ৮ ও ৯ ধারা অনুসারে জমির ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে বাধ্য। এরপর তাকে জমির মালিককে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রস্তাব পেশ ও জমির দখল গ্রহণের আগে ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ পরিশোধ করতে হবে। যদি ঐ জমির মালিক ক্ষতিপূরণের অর্থ গ্রহণ না করেন কিংবা আপত্তি তোলেন সেক্ষেত্রে ডেপুটি কমিশনার ক্ষতিপূরণের অর্থ সরকারি ট্রেজারিতে রাজস্ব জমা হিসেবে গচ্ছিত রাখবেন। এভাবে ঐ অর্থ জমা হয়ে যাবার পর আইনের দৃষ্টিতে ক্ষতিপূরণের অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে বলে গৃহীত হবে ও ডেপুটি কমিশনার সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির দখল গ্রহণের যোগ্য হবেন। কোন জমির মালিক জমির ক্ষতিপূরণে তার অংশ বা ক্ষতিপূরণ সিদ্ধান্ত অপর্যাপ্ত মনে করলে তেমন ক্ষেত্রে আইনের বিধান অনুযায়ী তিনি বিষয়টি সালিশদারের সমীপে কিংবা সালিশ আপিল ট্রাইবুন্যালে উত্থাপন করতে পারবেন। এই দুই সালিশ কর্তৃপক্ষ হবেন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা ও তারা হবেন যথাক্রমে সাব জজ ও জেলা জজ পদমর্যাদার অধিকারী।
বর্তমান আইনের অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, যে উদ্দেশ্যে জমি হুকুম দখল করা হয়েছে সে উদ্দেশ্যে ঐ জমির ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধান। যে উদ্দেশ্যে কোন জমি হকুমদখল করা হয় তা অন্য উদ্দেশ্যে, ভূমি মন্ত্রণালয়ের সরকারি পূর্বানুমতি ছাড়া, ব্যবহার নিষিদ্ধ। ব্যবস্থাটি গ্রহণের প্রয়োজন হয়েছে এ কারণে যে, যেসব কর্তৃপক্ষ জমি দখলের প্রয়োজনের কথা জানান তারা সাধারণত যতটুকু জমি তাদের সত্যিকার অর্থেই দরকার তারও চেয়ে বেশি জমি হুকুমদখল করান, আর এরকম জমি যে উদ্দেশ্যে হুকুমদখল করানো হয়, হয় তারা সে উদ্দেশ্যে জমি ব্যবহার করেন না বা জমি দীর্ঘকাল অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলে রাখেন। এতে ভূমির মতো বিরল সম্পদের ওপর চাপ পড়ে। তাই আইনে এখন ব্যবস্থা হয়েছে, যে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে সে উদ্দেশ্যে যদি ঐ জমি ব্যবহার করা না হয় কিংবা তা অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলে রাখা হয় তাহলে ঐ জমি ডেপুটি কমিশনারের কাছে সমর্পণ করতে হবে।
ভূমি অধিগ্রহণের আইন স্বত্ববঞ্চিতকারক (Exproprietory) সংবিধি আইন বিধায় এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ ও পরিবারসমূহকে বাধ্যতামূলকভাবে তাদের জমি থেকে বঞ্চিত হওয়ায় এ আইনে হুকুমদখলের বাধ্যতামূলক বৈশিষ্ট্যের বিবেচনায় জমির জন্য প্রকৃত ক্ষতিপূরণের একটা নির্ধারিত শতকরা হারে (বর্তমানে পঞ্চাশ শতাংশ) অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
সরকারি উদ্দেশ্যে কিংবা জনস্বার্থে কেবল সরকারের পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে সম্পত্তির সাময়িক অধিযাচিত হুকুমদখলেরও বিধান রয়েছে। অবশ্য এই পূর্বানুমতি গ্রহণের শর্ত জরুরি ক্ষেত্রে আরোপ করা হয় না। বিধানটি হলো এই যে, একমাত্র জরুরি পরিস্থিতি ব্যতিরেকে, পরিবহণ বা যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে কোন সম্পত্তি যা তার মালিক সত্যিকার অর্থেই তার নিজ বা তার পরিবারের বাসস্থান হিসেবে ব্যবহার করেন কিংবা যে জমি জনসাধারণ তাদের ধর্মীয়

উপাসনাস্থল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এতিমখানা বা হাসপাতাল, গণগ্রন্থাগার, গোরস্থান বা শ্মশান হিসেবে ব্যবহার করেন এমন সম্পত্তি অধিযাচিত অধিগ্রহণ করা যাবে না। এই বিধান নির্বাহী কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার দূষণীয় (culpable) ব্যবহার থেকে নাগরিকদের জন্য মূল্যবান রক্ষাব্যবস্থা দিয়েছে।
এই অধ্যাদেশের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান ভূমির চলতি অধিযাচন প্রক্রিয়াকে পূর্ববর্তী আইনের বিধানগুলি থেকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। এই দুই বিধান হলো, ক. হুকুমদখলাধীন সম্পত্তিটির ব্যবহার ও দখলের উদ্দেশ্যে যদি সংশ্লিষ্ট মেয়াদের জন্য তা ইজারায় দেওয়া হতো ও তার জন্য যে ভাড়া প্রদেয় হতো তার সাথে সঙ্গতি রেখে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ, এবং খ. সম্পত্তিটি যদি দুই বছরেরও বেশিকাল অধিযাচিত হুকুমদখলে রাখা হয় তাহলে ক্ষতিপূরণ সংশোধন।
জমি অধিগ্রহণ আইন প্রশাসনের কাজ করে থাকে বিভাগীয় পর্যায়ে কমিশনার ও জেলা পর্যায়ে ডেপুটি কমিশনারের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়। ঢাকা ও আরও কয়েকটি বিভাগীয় সদর দপ্তরে ভূমি অধিগ্রহণ মামলাগুলির গুরুত্ব এবং সংখ্যাধিক্য বিবেচনায়, এই কাজে ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তারা ছাড়াও জেলা কমিশনারকে একজন অতিরিক্ত জেলা কমিশনার (ভূমি অধিগ্রহণ) সহায়তা করে থাকেন। ভূমি ডেপুটি কমিশনারগণ যাতে তাদের এই কাজগুলি যথাযোগ্যভাবে এবং আইনের এখতিয়ারের মধ্যে থেকে আইনের মূল উদ্দেশ্যানুযায়ী সম্পাদন করেন সে বিষয় নিশ্চিত করার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় মাঝে মাঝেই নির্বাহী আদেশ জারি করেন।
অভিজ্ঞতায় লক্ষ্য করা গেছে, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের গৃহীত প্রকল্পের জন্য প্রকৃতপক্ষে কী পরিমাণ জমি প্রয়োজন তা নির্ধারণের জন্য কষ্ট স্বীকার করে না। তাদের বর্তমান চাহিদার পরিবর্তে ভবিষ্যতের প্রয়োজনে প্রকৃত প্রয়োজনের তুলনায় বেশি জমি চাওয়ার একটা প্রবণতা গড়ে উঠেছে। সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনই সাধারণত একতরফাভাবে স্থির করে তাদের কতটুকু জমি প্রয়োজন। আর যে জমি বরাদ্দ কমিটি জেলা ও জাতীয় স্তরের জন্য এসব চাহিদার অনুমোদন দান করে সেসব কমিটির হাতে সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবগুলি খুঁটিয়ে যাচাই করার সময় খুব কমই থাকে। এ বিষয়ে তেমন ক্ষমতাও তাদের থাকে না। সাধারণত তাই তারা আনুষ্ঠানিকতার গতানুগতিক ধারায় জমি চাহিদার প্রস্তাবগুলির অনুমোদন দিয়ে থাকে।
জমি অধিগ্রহণের ফলে স্থানীয় লোকালয় বা জনসমষ্টির ওপর কী প্রভাব-প্রতিক্রিয়া পড়ে তা নির্ধারণ করা কার্যত অসম্ভব ও কঠিন ব্যাপার। বাংলাদেশে জনসংখ্যার তুলনায় ভূমিসম্পদ নিতান্তই অপ্রতুল। তাই এ দেশের পক্ষে উন্নয়নের নামে ভূমির যথেচ্ছ ব্যবহার সম্ভব নয়। প্রকল্পের স্থান বাছাইয়ের বেলাতেও উল্লিখিত ধরনের অসাবধানি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। প্রতি জেলাতেই ডেপুটি কমিশনারের সভাপতিত্বে একটি এরকম স্থান নির্বাচন কমিটি থাকলেও এই কমিটি ক্বচিৎ ঐসব প্রস্তাবিত প্রকল্পস্থল পরিদর্শনে যান। এর ফলে প্রকল্পের জন্য স্থানটির উপযুক্ততা যাচাইয়ের অভাবে মূল্যবান আবাদি জমি তো বটেই, শহরের উপকণ্ঠ এলাকার জমিগুলিও অতি সচরাচর অ-কৃষি জমিতে রূপান্তর ও সেভাবে ব্যবহার করা হয় এবং তাতে আবাদি জমির অভাব আরও প্রকট হয়ে ওঠে।
সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের জমি উপযুক্ত কিনা কিংবা জনসাধারণের এতে প্রতিক্রিয়া কী এসব নিরূপণের লক্ষ্যে ডেপুটি কমিশনার যাতে প্রকল্পস্থল পরিদর্শনে যান সেই নির্দেশ দিয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় সকল ডেপুটি কমিশনারকে একটি পরিপত্র পাঠিয়েছে। বিধি সংশোধন, নোটিশ ও সার্কুলার ইস্যু ইত্যাদি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষগুলিকে সর্বাধিক স্বস্তি দেওয়ার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় প্রশাসন যন্ত্রের কাজের ওপর সার্বক্ষণিক দৃষ্টি রাখছে।
তিনটি পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান নিয়ে বর্তমানে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্রিটিশ আমল থেকেই বিশেষ মর্যাদা ভোগ করে আসছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রায় সকল পার্বত্য ভূমির মালিক সরকার। এসব ভূমি সংরক্ষিত বন বা অশ্রেণীকৃত রাষ্ট্রীয় বনাঞ্চল হিসেবে

বিদ্যমান। এই পার্বত্য জেলাগুলি প্রশাসনের একমাত্র আইনানুগ হাতিয়ার হলো ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রবিধান (১৯০০ সালের ১ নং প্রবিধান)। এর আওতায় ডেপুটি কমিশনার আগে বসতি স্থাপিত হয়ে থাকলেও সেসব ভূমির দখল গ্রহণে ক্ষমতাবান। কিন্তু প্রবিধানের আওতায় প্রণীত বিধি অনুযায়ী, অনুরূপ ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। পরবর্তীকালে ১৯৫৮ সালের প্রবিধান অনুযায়ী ডেপুটি কমিশনারকে জমি অধিগ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হলেও ১৯০০ সালের ১ নং প্রবিধান অনুযায়ী অধিগ্রহণ করা যায় না।

ভূমি প্রশাসন

ভূমি প্রশাসন বর্তমান বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রদ্বয় নিয়ে গঠিত উপমহাদেশের রাজনৈতিক ক্রমবিকাশের সাথে বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনার একটি যোগসূত্র রয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে ব্রিটিশদের আগমন পর্যন্ত এ দেশে তিনিই হতেন জমির মালিক যিনি জঙ্গল পরিষ্কার করে তা চাষযোগ্য করে তুলতেন। উৎপাদিত শস্যের একটি অংশ রাজাকে দেওয়া হতো জমির মালিক হিসেবে নয়, রাজা সার্বভৌম ক্ষমতাবলে চাষাবাদকারীকে নিরাপদে জমি ভোগদখলের নিশ্চয়তা বিধান করতেন বলে। এভাবেই কৃষকের সাথে রাজা বা সার্বভৌম ক্ষমতার সাথে জমির মালিকানার ব্যাপারে একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। রাজা-প্রজার এই সম্পর্ক রায়তওয়ারি পদ্ধতি নামে পরিচিত।

পদ্মা, যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র এই তিনটি প্রধান নদীর অববাহিকায় একটি বদ্বীপ আকারে গড়ে উঠেছে বাংলাদেশ। এছাড়াও দেশের সর্বত্র অসংখ্য নদ-নদী, শাখা নদী, উপনদী জালের মতো ছড়িয়ে আছে। প্রতি বছরই এ দেশের বিস্তীর্ণ এলাকা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। আবার নদীতে চর পড়ে নতুন ভূমিখন্ডের সৃষ্টি হয়। দেশের এই অভিনব ভৌগোলিক পরিবেশের জন্যই মুগল সম্রাটগণ সুবা বাংলায় (বর্তমান বাংলাদেশ) রায়তওয়ারি প্রথা প্রচলন করতে বাধাপ্রাপ্ত হন। তারা এ দেশে রায়তওয়ারি প্রথা প্রবর্তনের পরিবর্তে ভূমি রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব জমিদার নামে পরিচিত কিছু লোকের নিকট প্রদান করাই লাভজনক ও নিরাপদ বলে মনে করেন। জমিদারগণ জমির মালিকানা দাবি করতে পারতেন না, তারা শুধু সম্রাটের এজেন্ট হিসেবে নির্দিষ্ট এলাকার রাজস্ব আদায় করতেন।

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মুগল সম্রাট শাহ আলমের নিকট থেকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব প্রদানের অঙ্গীকারে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দীউয়ানি বা ভূমি রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা লাভ করেন। কোম্পানি এ দেশের বিভিন্ন এলাকায় রাজস্ব আদায়ের জন্য কালেক্টর পদবিধারী কর্মকর্তা নিয়োগ করেন। এই এলাকাগুলিকে পরবর্তীকালে জেলায় রূপান্তর করা হয়।

ভূমিরাজস্ব আদায় এবং ভূমিরাজস্ব সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির প্রশাসনে কালেক্টরদের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ ও তদারক করার জন্য ব্রিটিশ শাসন আমলে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে বোর্ড অব রেভিনিউ নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৮৫০ সালের বেঙ্গল বোর্ড অব রেভিনিউ অ্যাক্টের আওতায় এই বোর্ড পুনর্গঠন করা হয়। ১৯১৩ সালের বেঙ্গল বোর্ড অব রেভিনিউ অ্যাক্ট দ্বারা তা সর্বশেষ পুনর্গঠন করা হয়।

পাকিস্তান শাসন আমলে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সরকারের অধীনে রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট নামে একটি ডিপার্টমেন্ট সৃষ্টি করা হয়। বোর্ড অব রেভিনিউ এবং তার অধীনস্থ অফিসসমূহ এই ডিপার্টমেন্টের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ত করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের সচিব মর্যাদাসম্পন্ন ৩ বা ৪ জন সদস্য সমন্বয়ে বোর্ড অব রেভিনিউ গঠিত হতো। সদস্যদের মধ্যে একজনকে সিনিয়র সদস্য বলা হতো। কালেক্টরকে তার কাজে সহায়তা করার জন্য প্রতি জেলায় একটি অতিরিক্ত বা যুগ্ম কালেক্টর (রাজস্ব) এবং একটি রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টরের পদ, প্রতি মহকুমার জন্য একটি

করে মহকুমা ম্যানেজারের পদ এবং প্রতি থানার জন্য একটি করে সার্কেল অফিসারের পদ সৃষ্টি করা হয়। সাধারণত দুটি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত প্রতিটি তহসিলের জন্য একজন করে তহসিলদার নিয়োগ করা হয় এবং তার সাহায্যকারী হিসেবে এক বা দুই জন সহকারী তহসিলদার নিযুক্ত করা হয়।

বোর্ড অব রেভিনিউর কার্যাবলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল পরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ-এর অধীন সেটেলমেন্ট অপারেশন তত্ত্বাবধান করা, ভারত এবং পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত জেলাসমূহের মধ্যে আন্তর্জাতিক সীমানা চিহ্নিতকরণ পরিবীক্ষণ করা, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের মাধ্যমে ভূমি প্রশাসন ও ভূমি ব্যবস্থাপনা তদারক করা, ভূমি সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান করা এবং কমিশনার, কালেক্টর ও অন্যান্য রাজস্ব কর্মকর্তার আদেশের বিরুদ্ধে আনীত সকল আপিলের শুনানি ও চূড়ান্ত আদেশ প্রদান। এছাড়া ১৮৭৯ সালের কোর্ট অব ওয়ার্ডস অ্যাক্টের বিধান অনুসারে কোর্ট অব ওয়ার্ডস হিসেবে দায়িত্ব পালন করাও বোর্ডের কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত ছিল। বস্তুতত, বোর্ড অব রেভিনিউ ছিল সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্য রাজস্ব কর্তৃপক্ষ।

স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সরকারের রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের স্থলে আইন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়ের অধীন ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। পরবর্তীকালে এই বিভাগকে পূর্ণ মন্ত্রণালয়ের মর্যাদা দেওয়া হয়। ১৩ মার্চ, ১৯৭৩ তারিখে জারীকৃত আইএম-১০/৭২/১১৫(৫)আরএল নম্বর আদেশবলে বোর্ড অব রেভিনিউ এবং অধীনস্থ অফিসসমূহ বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। বোর্ডের কার্যাবলি মন্ত্রণালয়ের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ত করা হয়। রাজস্ব অফিসসমূহ তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন করার জন্য মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম সচিবকে পদাধিকারবলে ভূমি সংস্কার কমিশনার নিয়োগ করা হয়। বিভাগীয় পর্যায়ে রাজস্ব অফিসসমূহ পরিদর্শনের জন্য মন্ত্রণালয়ের ৪ জন উপ-সচিবকে পদাধিকারবলে উপভূমি সংস্কার কমিশনার নিয়োগ করা হয়। ভূমি সংস্কার কমিশনার এবং উপভূমি সংস্কার কমিশনারগণ ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়ে থেকেই তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতেন।

মন্ত্রণালয়ের মূল কাজ হচ্ছে নীতি নির্ধারণ করা। তাছাড়া ভূমি অধিগ্রহণ, শত্রু সম্পত্তি ও পরিত্যক্ত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা প্রভৃতিও মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বভুক্ত হওয়ায় এর কার্যপরিধি বেশ বেড়ে যায়। ফলে সেটেলমেন্ট অপারেশন, দিয়ারা জরিপ, খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান, আন্তঃরাষ্ট্র সীমানা চিহ্নিতকরণ প্রভৃতি বিষয় তদারকি করা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। অধিকন্তু, ক্রমবর্ধমান দায়িত্ব পালনের ফলে মন্ত্রণালয় ভূমি সংস্কার কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও ভূমিসংক্রান্ত আপিলের শুনানি দিয়ে নিষ্পত্তি করতে বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হয়। দেশে মুখ্য কোন রাজস্ব কর্তৃপক্ষ না থাকায় বিভাগীয় কমিশনারগণ, জেলা প্রশাসকগণ, ভূমি সংস্কার কমিশনার, ভূমি রেকর্ড ও জরিপের পরিচালক এবং অন্যান্য রাজস্ব কর্মকর্তা ভূমি প্রশাসন ও ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রয়োজনীয় উপদেশ, আদেশ-নির্দেশ ও দিক-নির্দেশনা লাভে ব্যর্থ হয়ে তাদের দায়িত্বাধীন বিষয়াদি নিষ্পত্তিতে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করেন। এসব অসুবিধা উপলব্ধি করে সরকার মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সাবেক বোর্ড অব রেভিনিউ-এর মতো একটি সংস্থা স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং ভূমি প্রশাসন বোর্ড আইন, ১৯৮০ (১৯৮১ সালের ১৩ নম্বর আইন) প্রণয়ন করে। এই আইনের ৩ ধারার (২) উপ-ধারার বিধান অনুযায়ী সরকার কর্তৃক একজন চেয়ারম্যান ও দুইজন সদস্য সমন্বয়ে ভূমি প্রশাসন বোর্ড গঠিত হয়। উক্ত আইনের ৩(২) ধারায় বিধান করা হয়েছিল যে, এই বোর্ড তার ওপর সরকার কর্তৃক অথবা কোন আইনের দ্বারা কিংবা আইনের অধীনে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করবে।

মন্ত্রণালয় ভূমি প্রশাসন বোর্ডের দায়িত্ব ও কার্যাবলি নির্ধারণ করে বিভিন্ন সময়ে আদেশ জারি করে। ১৯৮২ সালের ৩ সেপ্টেম্বর তারিখের আদেশে বোর্ডকে বিধিবদ্ধ আপিল শুনানি ও নিষ্পত্তিকরণ, ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার বাস্তবায়নে সরকারি নীতি ও নির্দেশনা মাঠ পর্যায়ের ভূমি অফিস কর্তৃক যথাযথ বাস্তবায়নের তত্ত্বাবধান এবং সরকারকে ভূমি-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চাহিদা মোতাবেক পরামর্শ প্রদানের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এছাড়া ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ ও আদায়, নতুন তহসিল অফিস স্থাপন, খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান, অভ্যন্তরীণ অডিট অফিস নিয়ন্ত্রণ এবং কোর্ট অব ওয়ার্ডস-এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব এই বোর্ডের ওপর অর্পিত হয়। মন্ত্রণালয়ের ৫ জুলাই, ১৯৮৩ তারিখের আদেশে অর্পিত সম্পত্তির (জমি ও ইমারত) ব্যবস্থাপনা ও তদারকি, পরিত্যক্ত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও নিষ্পন্নকরণ, বিনিময় কেসে জড়িত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন প্রণয়নের দায়িত্ব এই বোর্ডের ওপর ন্যস্ত করা হয়। মন্ত্রণালয় ৭ জুলাই, ১৯৮৩ তারিখের এক আদেশে মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ডস ও জরিপের নিয়ন্ত্রণাধীন সেটেলমেন্ট অপারেশন কার্যক্রম তত্ত্বাবধান, আন্তঃজেলা সীমানা চিহ্নিতকরণের পরিবীক্ষণ, জেলা পর্যায়ে তহসিল পর্যন্ত ভূমি প্রশাসন ইত্যাদি কাজকে উক্ত ভূমি প্রশাসন বোর্ডের দায়িত্বভুক্ত করা হয়। ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয় থেকে জারীকৃত ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪ তারিখের এক আদেশে ভূমি প্রশাসন বোর্ডের দায়িত্ব ও কার্যাবলি পুনর্বণ্টন করা হয় এবং সেটেলমেন্ট ডিপার্টমেন্টের কার্যাবলি তদারক, আন্তঃরাষ্ট্র ও আন্তঃজেলা সীমানা চিহ্নিতকরণ পরিবীক্ষণ এবং অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত দায়িত্বাবলি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

১৯৮৭ সালের প্রথম দিকে ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে ভূমি মন্ত্রণালয় করা হয়। ভূমি মন্ত্রণালয় নীতি নির্ধারণ এবং ভূমি সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণের দিকে অধিকতর দৃষ্টি দেওয়া সমীচীন মনে করে। এই সময়ে ভূমি সংস্কার অভিযান বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় পর্যায়ে রাষ্ট্রপতিকে (রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান) সভাপতি করে জাতীয় ভূমি সংস্কার পরিষদ গঠন করা হয়। ভূমি সংস্কার সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণ, জেলা ভূমি সংস্কার বাস্তবায়ন টাস্ক ফোর্স ও উপজেলা ভূমি সংস্কার কমিটির সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত প্রদান এবং ভূমি সংস্কার কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান জাতীয় ভূমি সংস্কার পরিষদের কার্যপরিধির অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভূমি প্রশাসন বোর্ড মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের কার্যাবলি তদারক এবং ভূমি সম্পর্কিত মামলার যথাযথ নিষ্পত্তি করতে ব্যর্থ হওয়ায় জাতীয় ভূমি সংস্কার পরিষদ ভূমি প্রশাসন বোর্ড বিলুপ্ত করে তদস্থলে ভূমি আপিল বোর্ড এবং ভূমি সংস্কার বোর্ড নামে দুটি বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য ভূমি সংস্কার বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সালের ১ নং অধ্যাদেশ) এবং ভূমি আপিল বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সালের ২নং অধ্যাদেশ) জারি করা হয়। পরবর্তীকালে ভূমি সংস্কার বোর্ড আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সালের ২৩ নং আইন) এবং ভূমি আপিল বোর্ড আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সালের ২৪ নং আইন) প্রণীত হলে উক্ত অধ্যাদেশদ্বয় রহিত করা হয়। ভূমি আপিল বোর্ড আইনের ৮(১) ধারায় ভূমি প্রশাসন বোর্ড আইন, ১৯৮০ রহিত করা হয়। ফলে ভূমি প্রশাসন বোর্ডের বিলুপ্তি ঘটে।

ভূমি আপিল বোর্ড আইনের ৪ ধারার ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক একজন চেয়ারম্যান ও দুইজন সদস্য সমন্বয়ে ভূমি আপিল বোর্ড গঠন করা হয়। উক্ত আইনের ৫ ধারায় বোর্ডের এখতিয়ার সম্বন্ধে বিধান রয়েছে যে, বোর্ড তার ওপর সরকার কর্তৃক অথবা কোন আইনের দ্বারা কিংবা আইনের অধীন অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করবে। ভূমি মন্ত্রণালয় ৯ অক্টোবর, ১৯৯০ ভূমি আপিল বোর্ড বিধিমালা, ১৯৯০ প্রণয়ন ও জারি করে। এই বিধিমালার ৩ বিধিতে বোর্ডের কার্যবণ্টন ও পদ্ধতি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। বোর্ড ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ভূমিবিষয়ক

সমুদয় আইনের অধীনে ভূমিসংক্রান্ত মামলা (রাজস্ব সম্পর্কীয়), নামজারি ও খারিজ মামলা, সায়েরাত ও জলমহাল সংক্রান্ত মামলা, ভূমি উন্নয়ন কর সম্পর্কিত সার্টিফিকেট মামলা, খাসজমি বন্দোবস্ত বিষয়ক মামলা, পি.ডি.আর অ্যাক্টের অধীনে দায়েরকৃত রিভিশন/আপিল মামলা, এবং অর্পিত, পরিত্যক্ত ও বিনিময় সম্পত্তি বিষয়ক মামলায় বিভাগীয় কমিশনারের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল/রিভিশন মামলা গ্রহণ ও শুনানি করে নিষ্পত্তি করতে পারে। উক্ত বিধিতে ভূমি আপিল বোর্ডকে অধস্তন ভূমি আদালতসমূহের কার্যক্রম পরিদর্শন, অনুবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং ভূমিসংক্রান্ত আইন, আদেশ ও বিধি সম্পর্কে সরকার কর্তৃক প্রেরিত বিষয়াদিতে পরামর্শদান করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ পৃথক এবং এককভাবে পক্ষগণকে শুনানিক্রমে আপিল/রিভিশন ও পুনর্বিবেচনার আবেদনের ওপর আদেশ প্রদান করেন এবং উক্ত আদেশ বোর্ডেরও আদেশ হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশের পুনর্বিবেচনা মামলায় আইনগত জটিলতা বা আইনের ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দিলে চেয়ারম্যান বিষয়টি ফুল বোর্ডে (চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সমন্বয়ে গঠিত বোর্ড) বিবেচনার জন্য উপস্থাপনের আদেশ প্রদান করতে পারেন এবং ফুল বোর্ড শুনানির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। পক্ষগণ স্বয়ং অথবা নিযুক্ত আইনজীবীর মাধ্যমে আপিল/রিভিশন ও পুনর্বিবেচনার আবেদন দায়ের করতে পারেন। বোর্ড প্রদত্ত কোন আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করার কোন বিধান নেই। ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমি প্রশাসন আইন সম্পর্কিত মামলা-মোকদ্দমা নিষ্পত্তিতে ভূমি আপিল বোর্ড সর্বোচ্চ ভূমি আদালত হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকে।
ভূমি সংস্কার বোর্ড আইনের ৪ ধারার ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক একজন চেয়ারম্যান ও দুইজন সদস্য সমন্বয়ে ভূমি সংস্কার বোর্ড গঠন করা হয়। ভূমি মন্ত্রণালয়ের ভূমিসংস্কার কমিশনার এবং উপ ভূমি সংস্কার কমিশনারের পদসমূহ অবলুপ্ত করা হয়। ভূমি সংস্কার বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীনে থেকে ভূমি সংস্কার কার্যক্রম ও ভূমি ব্যবস্থাপনা তদারকি করার জন্য প্রতি বিভাগে একটি উপভূমি সংস্কার কমিশনারের পদ সৃষ্টি করা হয়। উক্ত আইনের ৫ ধারায় বোর্ডকে সরকার কর্তৃক অর্পিত ভূমি সংস্কার ও ভূমি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন এবং কোন আইনের দ্বারা বা আইনের অধীন অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ২৩ মে ১৯৮৯ তারিখে সরকার কর্তৃক দায়িত্ব অর্পণ করে একটি আদেশ জারি করা হয়। অর্পিত দায়িত্ব ও কার্যাবলির মধ্যে রয়েছে: জেলা থেকে তহসিল পর্যায়ের সকল ভূমি অফিস ব্যবস্থাপনা, তত্ত্বাবধান এবং পরিবীক্ষণ, বিভাগীয় পর্যায়ে উপভূমি সংস্কার কমিশনারের কার্যালয়ের তত্ত্বাবধান, খাসজমি চিহ্নিতকরণ এবং সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতিমালা অনুযায়ী কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান এবং বেদখলি খাসজমি উদ্ধার, ভূমি উন্নয়ন করের দাবি নির্ধারণ ও আদায়, ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, কোর্ট অব ওয়ার্ডস-এর ব্যবস্থাপনা ও তদারকি, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে রেকর্ড রুম স্থাপন, তদারকি ও পরিদর্শন এবং বোর্ডের সকল সংস্থাপন ও হিসাব সম্পর্কিত সাধারণ প্রশাসন। ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি সাপেক্ষে ভূমি সংস্কার বোর্ড তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে থাকে।
কার্যকর ও দক্ষ ভূমি প্রশাসন ও ভূমি ব্যবস্থাপনার পূর্বশর্ত হচ্ছে: প্রতিটি ভূমিখন্ডের ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিচিতি নম্বর প্রদর্শনপূর্বক নকশা প্রস্ত্ততকরণ, জমির মালিকানা, অংশ, পরিমাণ ও কর সম্পর্কিত তথ্যাদি সংরক্ষণ, মালিকের দখলিস্বত্ব প্রমাণের জন্য স্বত্বলিপি (খতিয়ান) প্রস্ত্তত ও প্রকাশকরণ এবং স্বত্বলিপি সংরক্ষণ ও মালিকানার পরিবর্তন হালনাগাদকরণ। ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীন ভূমি রেকর্ডস ও জরিপ অধিদপ্তরের দায়িত্ব হচ্ছে নকশা ও হালনাগাদ রেকর্ড বা স্বত্বলিপি প্রস্ত্ততকরণ। কিছুসংখ্যক পরিচালক, উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক, সেটেলমেন্ট অফিসার, সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার এবং দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বহুসংখ্যক

কর্মচারীর সহযোগিতায় মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ডস ও জরিপ অধিদপ্তরের ১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের বিধান অনুসারে নকশা ও স্বত্বলিপি প্রস্‌ত্তত করেন এবং জেলা প্রশাসক বা কালেক্টরদের নিকট হস্তান্তর করেন। কালেক্টরগণ তা সংরক্ষণ করেন এবং হস্তান্তর, উত্তরাধিকার বা অন্যকোন কারণে কোন পরিবর্তন হলে তা সন্নিবেশ করেন।

জরিপ ও বন্দোবস্‌ত

জরিপ ও বন্দোবস্ত ভূমিতে জমিদার ও রায়তের অধিকার শনাক্তকরণের একটি প্রাচীন পদ্ধতি। ১৮৮৮ থেকে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ১৮৮৫এর অধীনে জরিপের মাধ্যমে বন্দোবস্ত করে ভূমিতে সকল স্বার্থসংশ্লিষ্ট শ্রেণির দায় অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি অপারেশন শুরু হয়। ব্রিটিশ শাসনের অবসান পর্যন্ত এ অপারেশন অব্যাহত ছিল। ভূমি জরিপের কাজ ভিন্নরূপে এখনও অব্যাহত রয়েছে।

জরিপ ও বন্দোবস্ত অপারেশন শুরু হয় কতিপয় বিচ্ছিন্ন এলাকা ধরে। যেমন, বাকেরগঞ্জের দক্ষিণ শাহবাজপুর এস্টেট (১৮৮৯-৯৫), সিলেট জেলার জৈন্তিয়া পরগনা (১৮৯২-৯৯), ত্রিপুরা ও নোয়াখালী জেলার রওশনাবাদ পরগনা (১৮৯২-৯৯), বাকেরগঞ্জ, ঢাকা ও ফরিদপুর জেলায় অবস্থিত বাসুদেব রায় ও কালীশঙ্কর সেন এস্টেটদ্বয় (১৮৯৪-৯৫ থেকে ১৯০০-১৯০১), বগুড়া জেলার জয়পুর এস্টেট (১৮৯৮), ত্রিপুরা জেলার পাটিকারা ওয়ার্ড এস্টেট (১৯০৫-০৬), বাকেরগঞ্জ দিয়ারা অপারেশন (নদী জরিপ), এবং বাকেরগঞ্জ জেলার তুষখালী সরকারি এস্টেট (১৯০৫-০৬)। জেলা জরিপ ও বন্দোবস্ত অপারেশন প্রধান দুটি পর্বে সম্পাদিত হয়।

প্রথম পর্বের জেলা জরিপ জেলাওয়ারি ভূমির জরিপ ও বন্দোবস্ত অপারেশন শুরু হয় ১৮৮৮ সাল থেকে এবং শেষ হয় ১৯৪০ সালে। সারণি-১-এ জেলাভিত্তিক জরিপ ও বন্দোবস্ত অপারেশনের স্থান, সময় ও সেটেলমেন্ট অফিসার-এর তালিকা দেওয়া হয়েছে।

সারণি ১ প্রথম পর্বের জেলা জরিপ

জেলার নাম#সময়কাল#সেটেলমেন্ট অফিসার

চট্টগ্রাম#১৮৮৮-৯৮ #সি. জি অ্যালেন

বাকেরগঞ্জ#১৯০৪-১৬ #জে. সি জ্যাক

ফরিদপুর#১৯০৪-১৪ #জে. সি জ্যাক

ময়মনসিংহ#১৯০৮-১৯ #এফ. এ স্যাকসে

ঢাকা#১৯১০-১৭#এফ. ডি এসকোলি

রাজশাহী#১৯১২-২২#ডব্লিউ. এইচ নেলসন

নোয়াখালী#১৯১৪-১৯#ডব্লিউ. এইচ টমসন

ত্রিপুরা (কুমিল্লা)#১৯১৫-১৯ #ডব্লিউ. এইচ টমসন

যশোর#১৯২০-২৪ #এম. এ মোমেন

নদীয়া#১৯১৮-২৬ #জে. এম প্রিঙ্গল

খুলনা#১৯২০-২৬#এল. আর ফুকাস

পাবনা-বগুড়া#১৯২০-২৯ #ডনাল্ড. এফ. সি ফেরসন

মালদহ#১৯২৮-৩৫ #ডনাল্ড. এফ. সি ফেরসন

রংপুর#১৯৩১-৩৮ #এ. সি হার্টলি

দিনাজপুর#১৯৩৪-৪০ #এফ. ও বেল
সিলেট#১৯৫০-৬৪#এন. আহমেদ
খুলনা (শুধু সুন্দরবন)#১৯৪০-৫০ #এস.এ মজিদ এবং এম. হক
দ্বিতীয় পর্বের জেলা জরিপ জনসংখ্যা বৃদ্ধি, প্রজন্মান্তর ও অন্যান্য পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ভূমি অধিকার কালানুগ করার লক্ষ্যে দ্বিতীয় পর্বের জরিপকাজ শুরু হয় চট্টগ্রাম জেলাকে প্রথম ধরে। সেটেলমেন্ট অফিসার ছিলেন জে. বি কাইন্ডার্সলি। এরপর জরিপ হয় বাকেরগঞ্জ জেলায় (১৯৪০-৪২)। বাকেরগঞ্জ জরিপের অফিসার ছিলেন আর. ডব্লিউ বাস্টিন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কারণে জরিপ বন্ধ রাখা হয়। জরিপকাজ পুনরায় শুরু হয় ১৯৪৫ সালে। এর সেটেলমেন্ট অফিসার ছিলেন এ. কে মুখার্জি। মুখার্জি ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত জরিপ চালানোর পর ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর তিনি উক্ত দায়িত্ব ছেড়ে ভারতে চলে যান। তাঁর স্থলে এম. হক বাকেরগঞ্জের সেটেলমেন্ট অফিসার নিযুক্ত হন।
১৯৫০ সালের পূর্ববঙ্গ জমিদারি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন পূর্বেকার জরিপ পদ্ধতি অনেকটা বদলে দেয়। এ আইনের পর ভূমিতে জমিদারি স্বত্ব ও মধ্যস্বত্ব না থাকায় জরিপের ভূস্বত্ব-সক্রান্ত দলিল নতুনভাবে তৈরি করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এ অপারেশনে প্রথম ধরা হয় কোর্ট অব ওয়ার্ডস পরিচালিত এস্টেটগুলি। তারপর একে একে সকল বৃহৎ জমিদারি অধিগ্রহণ করা হয়। জমিদারি অধিগ্রহণ ও বন্দোবস্ত জরিপ একই সঙ্গে শুরু হয়। সারা দেশকে মোট আটটি ব্লকে বিভক্ত করে এ জরিপ অপারেশন শুরু হয়। সারণি-২-এ এতদসংক্রান্ত তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে।
সারণি ২ দ্বিতীয় পর্বের জেলা জরিপ
ব্লক#জরিপ এলাকা #সেটেলমেন্ট অফিসার
কুমিল্লা#কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম #টি. হোসেন
ঢাকা#ঢাকা#এস. আহমদ
ফরিদপুর #ফরিদপুর, কুষ্টিয়া#এ. এম. কে মাসুদ
রাজশাহী#রাজশাহী, পাবনা#এস. জি শাহ
রংপুর #রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া#এম. ইসলাম
খুলনা#খুলনা, যশোর, বাকেরগঞ্জ #এম. হক
ময়মনসিংহ #ময়মনসিংহ#এন. আহমেদ
সিলেট#সিলেট#এ. কে আহমদ খান
জমিদারি অধিগ্রহণ বন্দোবস্তের প্রধানত দুটি উদ্দেশ্য ছিল: প্রথমত, জমিদারদের ক্ষতিপূরণ নির্ণয় করার লক্ষ্যে একটি সংশোধিত খতিয়ান ও মানচিত্র তৈরি করা; আর দ্বিতীয়ত, সরকার কর্তৃক ভূমিরাজস্ব সংগ্রহের সুবিধার্থে মৌজাওয়ারি খাজনা তালিকা প্রস্তুতত করা। সরকার দ্বিতীয় লক্ষ্যটির ওপর সমধিক জোর দেয়। আপাতত, জমির ছকওয়ারি পূর্ণ জরিপ না করে শুধু জমিদারি কাগজের ওপর ভিত্তি করেই খাজনা ও তালিকা প্রস্তুতত করা হয়, যেন এর ওপর ভিত্তি করেই সরকারের তহসিল অফিস ভূমিরাজস্ব সংগ্রহ প্রক্রিয়া শুরু করতে পারে। এ পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে অল্পকালের মধ্যে সারা দেশে জরিপকাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত এ জরিপকাজ চলে।
এদিকে সিলেট জেলা জরিপের জন্য একটি আলাদা ব্যবস্থা উদ্ভাবন করতে হয়। সিলেট জেলা ইতঃপূর্বে আসামের অন্তর্ভুক্ত থাকায় ওই জেলায় কখনও বাংলার জেলাসমূহের মতো পূর্ণমাত্রায় ক্যাডাস্ট্রাল জরিপ হয় নি। ১৯৫০ থেকে ১৯৬৪ সালের মধ্যে একটি পূর্ণ ক্যাডাস্ট্রাল জরিপ ও বন্দোবস্ত অপারেশন সম্পন্ন করা হয়।

নতুন জরিপ ও বন্দোবস্ত পর্ব জরিপ ও বন্দোবস্তের সংশোধন ও হাল অবস্থায় আনার জন্য ১৯৬৫ সাল থেকে নব পর্যায়ে জরিপ ও বন্দোবস্ত প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের জন্য প্রথম জরিপ করা হয় রাজশাহী জেলা। একই সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান ব্যাপী দিয়ারা জরিপও শুরু হয়। ১৯৭৮ সাল নাগাদ যেসব জেলার সংশোধন জরিপ শেষ হয় সেগুলি হলো ঢাকা, চট্টগ্রাম, পাবনা, কুষ্টিয়া, ময়মনসিংহ ও জামালপুর।

১৯৮৪ সালে জরিপ ব্যাপারে একটি নতুন প্রকল্প নেওয়া হয়। ওই প্রকল্পে ২২টি মূল জেলা সদরকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশকে মোট ২২টি জোনে বিভক্ত করে জরিপকাজ আরম্ভ হয়। পর্যায়ক্রমে প্রতিটি জোনের জরিপ ও বন্দোবস্ত পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। একই সঙ্গে, প্রয়োজনীয় দক্ষ লোকবলের প্রকট অভাবের কারণে সকল জেলার জরিপকাজ পরিচালনা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। প্রথমে দশটি জোন ধরে জরিপ শুরু হয়। এগুলি হচ্ছে, খুলনা, বরিশাল, যশোর, ফরিদপুর, নোয়াখালী, কুমিল্লা, সিলেট, টাঙ্গাইল, রংপুর ও বগুড়া। পরে দেখা যায় যে, উক্ত দশটি জেলার জন্যও দক্ষ লোকবলের অভাব রয়েছে। বাস্তব অসুবিধার প্রেক্ষাপটে শুধু কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, রংপুর এবং বগুড়ায় জরিপ ও বন্দোবস্ত অপারেশন শুরু করতে হয়। তিন বছরের মধ্যে এ জেলাগুলির জরিপ শেষ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

বন্দোবস্ত প্রতিবেদন জরিপ ও বন্দোবস্ত প্রতিবেদনের একটি নির্দিষ্ট ছক রয়েছে। বন্দোবস্ত অপারেশন সমাপ্তির পর জরিপ ও সেটেলমেন্ট অফিসার একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন তৈরি করেন। প্রতিবেদনে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বিশদ বিবরণ থাকে, যেমন ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, ঐতিহাসিক ও আর্থসামাজিক বিবরণ, ভূমি ব্যবস্থা ও ভূমি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ঐতিহাসিক ও পরিসংখ্যানগত তথ্য, কৃষি অবকাঠামো ও কৃষিফসল সংক্রান্ত তথ্য, একরভিত্তিক শস্য ফলন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

দীউয়ানি

দীউয়ানি মুগল যুগের প্রাদেশিক রাজস্ব শাসন পদ্ধতি এবং বাংলায় কোম্পানি শাসন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে গৃহীত একটি প্রাথমিক কৌশল। মুগল প্রাদেশিক প্রশাসনের দুটি প্রধান শাখা ছিল নিজামত ও দীউয়ানি। ব্যাপক অর্থে নিজামত হচ্ছে সাধারণ প্রশাসন এবং দীউয়ানি হচ্ছে রাজস্ব প্রশাসন। প্রাদেশিক সুবাহদার ছিলেন নিজামতের প্রধান (এ জন্য তাকে নাজিমও বলা হতো) এবং দীউয়ান ছিলেন সাধারণ প্রশাসনের, বিশেষ করে রাজস্ব প্রশাসনের প্রধান। সুবাহ প্রশাসনের ক্ষমতায় ভারসাম্য রক্ষা করার প্রয়োজনে মুগল সম্রাট...

<u>“নামজারী” কাকে বলে?</u>

ক্রয়সূত্রে/উত্তরাধিকার সূত্রে অথবা যেকোন সূত্রে জমির নতুন মালিক হলে নতুন মালিকের নাম সরকারি খতিয়ানভুক্ত করার প্রক্রিয়াকে নামজারী বলা হয়।

"জমা খারিজ"কাকে বলে?
যৌথ জমা বিভক্ত করে আলাদা করে নতুন খতিয়ান সৃষ্টি করাকে জমা খারিজ বলে। অন্য কথায় মূল খতিয়ান থেকে কিছু জমির অংশ নিয়ে নতুন জোত বা খতিয়ান সৃষ্টি করাকে জমা খারিজ বলে।
"খতিয়ান" কাকে বলে?
ভূমি জরিপকালে ভূমি মালিকের মালিকানা নিয়ে যে বিবরণ প্রস্তুত করা হয় তাকে "থতিয়ান" বলে। খতিয়ান প্রস্তত করা হয় মৌজা ভিত্তিক। আমাদের দেশে CS, RS, SA এবং সিটি জরিপ সম্পন্ন হয়েছে। এসব জরিপকালে ভূমি মালিকের তথ্য প্রস্তত করা হয়েছে তাকে "খতিয়ান" বলে। যেমন CS খতিয়ান, RS খতিয়ান...
খতিয়ান সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন

"পর্চা" কাকে বলে?
ভূমি জরিপকালে চূড়ান্ত খতিয়ান প্রস্তত করার পূর্বে ভূমি মালিকদের নিকট খসড়া খতিয়ানের যে অনুলিপি ভুমি মালিকদের প্রদান করা করা হ তাকে **"মাঠ পর্চা"** বলে। এই **মাঠ পর্চা** রেভিনিউ/রাজস্ব অফিসার কর্তৃক তসদিব বা সত্যায়ন হওয়ার পর যদি কারো কোন আপত্তি থাকে তাহলে তা শোনানির পর খতিয়ান চুড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়। আর চুড়ান্ত খতিয়ানের অনুলিপিকে **"পর্চা"** বলে।

"মৌজা" কাকে বলে?
যখন CS জরিপ করা হয় তখন থানা ভিত্তিক এক বা একাধিক গ্রাম, ইউনিয়ন, পাড়া, মহল্লা অালাদা করে বিভিন্ন এককে ভাগ করে ক্রমিক নাম্বার দিয়ে চিহ্তি করা হয়েছে। আর বিভক্তকৃত এই প্রত্যেকটি একককে মৌজা বলে।

"তফসিল" কাকে বলে?
জমির পরিচয় বহন করে এমন বিস্তারিত বিবরণকে "তফসিল" বলে। তফসিলে, মৌজার নাম, নাম্বার, খতিয়ার নাম্বার, দাগ নাম্বার, জমির চৌহদ্দি, জমির পরিমাণ সহ ইত্যাদি তথ্য সন্নিবেশ থাকে।

"দাগ" নাম্বার কাকে বলে?
যখন জরিপ ম্যাপ প্রস্তুত করা হয় তখন মৌজা নক্সায় ভূমির সীমানা চিহ্নিত বা সনাক্ত করার লক্ষ্যে প্রত্যেকটি ভূমি খন্ডকে আলাদা আলাদ নাম্বার দেয়া হয়। আর এই নাম্বারকে **দাগ নাম্বার** বলে। একেক দাগ নাম্বারে বিভিন্ন পরিমাণ ভূমি থাকতে পারে। মূলত, দাগ নাম্বার অনুসারে একটি মৌজার অধীনে ভূমি মালিকের সীমানা খূটিঁ বা আইল দিয়ে সরেজমিন প্রর্দশন করা হয়।

“ছুটা দাগ” কাকে বলে?
ভূমি জরিপকালে প্রাথমিক অবস্থায় নকশা প্রস্তুত অথবা সংশোধনের সময় নকশার প্রতিটি ভূমি একককে যে নাম্বার দেওয়া হয় সে সময় যদি কোন নাম্বার ভুলে বাদ পড়ে তাবে ছুটা দাগ বলে। আবার প্রাথমিক পর্যায়ে যদি দুটি দাগ একত্রিত করে নকশা পুন: সংশোধন করা হয় তখন যে দাগ নাম্বার বাদ যায় তাকেও ছুটা দাগ বলে।

“খানাপুরি” কাকে বলে?
জরিপের সময় মৌজা নক্সা প্রস্তুত করার পর খতিয়ান প্রস্তুতকালে খতিয়ান ফর্মের প্রত্যেকটি কলাম জরিপ কর্মচারী কর্তৃক পূরন করার প্রক্রিয়াকে খানাপুরি বলে।

আমিন” কাকে বলে?
ভূমি জরিপের মাধ্যমে নক্সা ও খতিয়ান প্রস্তত ও ভূমি জরিপ কাজে নিজুক্ত কর্মচারীকে আমিন বলে।

“কিস্তোয়ার” কাকে বলে?
ভূমি জরিপ কালে চতুর্ভুজ ও মোরব্বা প্রস্তত করার পর সিকমি লাইনে চেইন চালিয়ে সঠিকভাবে খন্ড খন্ড ভুমির বাস্তব ভৌগলিক চিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে নকশা প্রস্তুতের পদ্ধতিকে কিস্তোয়ার বলে।

“খাজনা” ককে বলে?সরকার বার্ষিক ভিত্তিতে যে প্রজার নিকট থেকে ভূমি ব্যবহারের জন্য যে কর আদায় করে তাকে খাজনা বলে।

“দাখিলা” কাকে বলে?
ভূমি কর/খাজনা আদায় করে যে নির্দিষ্ট ফর্মে (ফর্ম নং১০৭৭) ভূমি কর/খাজনা আদায়ের প্রমান পত্র বা রশিদ দেওয়া হয় তাকে দাখিলা বলা হয়।

DCR কাকে বলে?
ভূমি কর ব্যতিত আন্যান্য সরকারি পাওনা আদায় করার পর যে নির্ধারিত ফর্মে (ফর্ম নং ২২২) রশিদ দেওয়া হয় তাকে DCR বলে।

“কবুলিয়ত” কাকে বলে?
সরকার কর্তৃক কৃষককে জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার প্রস্তাব প্রজা কর্তৃক গ্রহণ করে খাজনা প্রদানের যে অঙ্গিকার পত্র দেওয়া হয় তাকে কবুলিয়ত বলে।

“নাল জমি” কাকে বলে?
২/৩ ফসলি সমতল ভূমিকে নাল জমি বলা হয়।

“খাস জমি” কাকে বলে?
সরকারের ভূমি মন্ত্রনালয়ের আওতাধিন যে জমি সরকারের পক্ষে কালেক্টর বা ডিসি তত্ত্বাবধান করেন এমন জমিকে খাস জমি বলে।
“চান্দিনা ভিটি” কাকে বলে?
হাট বাজারের স্থায়ী বা অস্থায়ী অকৃষি জমির যে অংশ প্রজার প্রতি বরাদ্ধ দেওয়া হয় তাকে চান্দিনা ভিটি বলে।

“ওয়াকফ” কাকে বলে?
ইসলামি বিধান অনুযায়ী কোন ভূমি তার মালিক কর্তৃক ধর্মীয় ও সমাজ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের ব্যয় ভার বহন করার উদ্দেশ্যে কোন দান করাকে ওয়াকফ বলে

“মোতয়াল্লী” কাকে বলে?
যিনি ওয়াকফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান করেন তাকে মোতওয়াল্লী বলে। ওয়াকফ প্রশাসকের অনুমতি ব্যতিত মোতওয়াল্লী ওয়াকফ সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারে না।

“দেবোত্তর” সম্পত্তি কাকে বলে?
হিন্দুধর্ম মতে, ধর্মীয় কাজের জন্য উৎসর্গকৃত ভূমিকে দেবোত্তর সম্পত্তি বলে।

“ফারায়েজ” কাকে বলে?
ইসলামি বিধান মোতাবেক মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বন্টন করার নিয়ম ও প্রক্রিয়াকে ফারায়েজ বলে।

“ওয়ারিশ” কাকে বলে?
ওয়ারিশ অর্থ উত্তরাধিকারী । ধর্মীয় বিধানের অনুয়ায়ী কোন ব্যক্তি উইল না করে মৃত্যু বরন করলেতার স্ত্রী, সন্তান বা নিকট আত্মীয়দের মধ্যে যারা তার রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে মালিক হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন এমন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে ওয়ারিশ বলে।

“সিকস্তি” কাকে বলে?
নদী ভাংঙ্গনের ফলে যে জমি নদী গর্ভে বিলিন হয়ে যায় তাকে সিকস্তি বলে। সিকস্তি জমি যদি ৩০ বছরের মধ্যে স্বস্থানে পয়স্তি হয় তাহলে সিকস্তি হওয়ার প্রাক্কালে যিনি ভূমি মালিক ছিলেন তিনি বা তাহার উত্তরাধিকারগন উক্ত জমির মালিকানা শর্ত সাপেক্ষ্যে প্রাপ্য হবেন।

“পয়স্তি” কাকে বলে?
নদী গর্ভ থেকে পলি মাটির চর পড়ে জমির সৃষ্টি হওয়াকে পয়স্তি বলে।

“দলিল” কাকে বলে?
যে কোন লিখিত বিবরণ আইনগত সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য তাকে দলিল বলা হয়। তবে রেজিস্ট্রেশন আইনের বিধান মোতাবেক জমি ক্রেতা এবং বিক্রেতা সম্পত্তি হস্তান্তর করার জন্য যে চুক্তিপত্র সম্পাদন ও রেজিস্ট্রি করেন সাধারন ভাবেতাকে দলিল বলে।

ভূমি বা Land কাকে বলে?

“ভূমি কাকে বলে?”- এর আইনী সংজ্ঞা রয়েছে। The State Acquisition and Tenancy Act, 1950- এর ২(১৬)- ধারা মতে,
“ভূমি (land) বলতে আবাদি, অনাবাদি অথবা বছরের যেকোন সময় পানিতে ভরা থাকে এবং ভূমি হতে প্রাপ্ত সুফল, ঘরবাড়ি বা দালান কোঠা বা মাটির সঙ্গে সংযুক্ত অন্যান্য দ্রব্য অথবা স্হায়ীভাবে সংযুক্ত দ্রব্য এর অন্তর্ভুক্ত বুঝাবে।”

ভূমি জরিপ/রেকর্ড কাকে বলে?

ভূমি জরিপ হচ্ছে ভূমির মালিকানা সম্বলিত ইতিহাসের সরেজমিন ইতিবৃত্ত। আইনী সংজ্ঞা হচ্ছে, The Survey Act, 1875 এবং সংশ্লিষ্ট বিধিমালা অনুযায়ী সরকারের জরিপ বিভাগ সরেজমিন জরিপ করে ভূমির মালিকানার যে বিবরণ এবং নকশা তৈরী করে তাই রেকর্ড বা জরিপ। অর্থাৎ রেকর্ড বা জরিপ হচ্ছে মালিকানার বিরবণ এবং নকশার সমন্বয়।

একটি ভূমির মালিক কে এবং তার সীমানা কতটুকু এটা ভূমি জরিপের মাধ্যমে নকশা/ম্যাপ নির্ণয় করা হয়। এই নকশা এবং ম্যাপ অনুসারে মালিকানা সম্পর্কিত তথ্য যেমন ভূমিটি কোন মৌজায় অবস্থিত, এর খতিয়ান নাম্বার, ভূমির দাগ নাম্বার, মালিক ও দখলদারের বিবরণ ইত্যাদি প্রকাশিত হয় যাকে খতিয়ান বলে। রেকর্ড বা জরিপ প্রচলিতভাবে খতিয়ান বা স্বত্বলিপি বা Record of Rights (RoR) নামেও পরিচিত। রেকর্ড বা জরিপের ভিত্তিতে ভূমি মালিকানা সম্বলিত বিবরণ খতিয়ান হিসেবে পরিচিত, যেমন CS খতিয়ান, RS খতিয়ান, ইত্যাদি।

আমাদের দেশে পরিচালিত ভূমি জরিপ বা রেকর্ড গুলো হচ্ছে;

1. CS -Cadastral Survey
2. SA- (1956)
3. RS -Revitionel Survey
4. PS – Pakistan Survey
5. BS- Bangladesh Survey (1990)

ক) সি.এস. জরিপ/রেকর্ড (Cadastral Survey)

“সিএস” হলো Cadastral Survey (CS) এর সংক্ষিপ্ত রূপ। একে ভারত উপমহাদেশের প্রথম জরিপ বলা হয় যা ১৮৮৮ সাল হতে ১৯৪০ সালের মধ্যে পরিচালিত হয়। এই জরিপে বঙ্গীয় প্রজাতন্ত্র আইনের দশম অধ্যায়ের বিধান মতে দেশের সমস্ত জমির বিস্তারিত নকশা প্রস্তুত করার এবং প্রত্যেক মালিকের জন্য দাগ নম্বর উল্লেখপুর্বক খতিয়ান প্রস্তুত করার বিধান করা হয়। প্রথম জরিপ হলেও এই জরিপ প্রায় নির্ভূল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। মামলার বা ভূমির জটিলতা নিরসনের ক্ষেত্রে এই জরিপকে বেস হিসেবে অনেক সময় গণ্য করা হয়।

খ) এস.এ. জরিপ (State Acquisition Survey)

১৯৫০ সালে জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হওয়ার পর সরকার ১৯৫৬ সালে সমগ্র পূর্ববঙ্গ প্রদেশে জমিদারী অধিগ্রহনের সিদ্ধান্ত নেয় এরং রায়েতের সাথে সরকারের সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে জমিদারদের প্রদেয় ক্ষতিপুরণ নির্ধারন এবং রায়তের খাজনা নির্ধারনের জন্য এই জরিপ ছিল। জরুরী তাগিদে জমিদারগন হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই জরিপ বা খাতিয়ান প্রণয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছিল।

গ) আর.এস. জরিপ (Revisional Survey)

সি. এস. জরিপ সম্পন্ন হওয়ার সুদীর্ঘ ৫০ বছর পর এই জরিপ পরিচালিত হয়। জমি, মলিক এবং দখলদার ইত্যাদি হালনাগাদ করার নিমিত্তে এ জরিপ সম্পন্ন করা হয়। পূর্বেও ভুল ত্রুটি সংশোধনক্রমে আ. এস জরিপ এতই শুদ্ধ হয় যে এখনো জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের ক্ষেত্রে আর, এস জরিপের উপর নির্ভর করা হয়। এর খতিয়ান ও ম্যাপের উপর মানুষ এখনো অবিচল আস্থা পোষন করে।

ঘ) সিটি জরিপ (City Survey)

সিটি জরিপ এর আর এক নাম ঢাকা মহানগর জরিপ। আর.এস. জরিপ এর পর বাংলাদেশ সরকার কর্তিক অনুমতি ক্রমে এ জরিপ ১৯৯৯ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়। এ যবত কালে সর্বশেষ ও আধুনিক জরিপ এটি। এ জরিপের পরচা কম্পিউটার প্রিন্ট এ পকাশিত হয়।

ঙ) দিয়ারা জরিপ কি?

দিয়ারা জরিপ হলো দরিয়া সম্পর্কিত জরিপ। জেগে উঠা নতুন ভূখন্ড (চর) জেলা প্রশাসকের চাহিদার ভিত্তিতে সিকস্তি পয়স্তির কারণে ভৌগলিক সীমারেখা ও স্বত্বের পরিবর্তন হলে নদী ও সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় নতুন জরিপ করা হয়। এ সমস্ত জরিপে নকশা ও রেকর্ড প্রস্তুত করা হয়। এটি অতি পুরাতন জরিপ। ক্যাডাস্ট্রাল জরিপ আরম্ভ হয় ১৮৮৮ সালে, পক্ষান্তরে দিয়ারা জরিপ আরম্ভ হয় ১৮৬২ সালে। দিয়ারা জরিপে সাধারন জরিপের জন্য প্রযোজ্য সকল স্তর অনুসরন করে পয়স্তি ভূমির(চর) নক্সা ও রেকর্ড প্রস্তুত করা হয় দিয়ারা সেটেলমেন্ট অফিসারের নেতৃত্বে ৪টি (রাজশাহী, নরসিংদী, চট্রগ্রাম ও বরিশাল) বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক অফিস ও ক্যাম্পের মাধ্যমে সারাদেশের সুনির্দিষ্ট কিছু মৌজায় এ জরিপ কাজ পরিচালিত হয়।

“পর্চা”, “দাগ”, “খতিয়ান”, “মৌজা”, “জমা খারিজ”, “নামজারি”, “তফসিল” কাকে বলে??? এবং ভূমি বিষয়ক জরুরী সব তথ্য জানতে এখানে ক্লিক করুন….

ভূমি জরিপ চলাকালে ভূমি মালিকদের যা করণীয়

ভূমি মালিকের জন্য ভূমি বা জমি জরিপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। জমি জরিপের সময় জমির মালিকানার উপর ভিত্তি করে জমি রেকর্ড তথা খতিয়ান বা স্বত্ব লিপি তৈরি করা হয়। সাধারণত কোন এলাকায় জমি জরিপ শুরু হওয়ার আগে ভূমি প্রশাসন বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সেই এলাকার জনগণকে অবহিত করেন অনেক সময় ভুমি প্রশাসন কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মনে করলে মাইক দ্বারা মাইকিং করে জরিপের ব্যাপারে জনগণকে নিশ্চিত করেন। তারপর পূর্ব ঘোষিত নির্দিষ্ট তারিখ অনুযায়ী ভূমি প্রশাসনের কর্মী তথা সার্ভে কর্মকর্তা বা আমিন গন জমির মালিকের সহায়তায় তাদের জরিপের কাজ শুরু করে দেন।

>

এক্ষেত্রে জমির মালিকগণের যে কাজটি পূর্বেই করে রাখতে হবে তাহলো তাদের নিজস্ব জমির সীমানা নির্ধারণ করে রাখা, এতে জমি জরিপের সময় নিজে অথবা জমির মালিকের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি (যেমন ছেলে) জরিপ কর্মচারী বা আমিনদেরকে জরিপ কাজে সহায়তা করবে।

>

জমির মালিককে সংশ্লিষ্ট জমি অর্থাত্‍ যে জমির জরিপ কাজ শুরু হবে সেই জমির আগের রেকর্ডের পর্চা বা দলিল দস্তাবেজ নিয়ে মালিক বা তার অভিজ্ঞ এবং বিশ্বস্ত প্রতিনিধি মাঠে হাজির থেকে জরিপকারীর নিকট যথাযথভাবে উপস্থাপন করে নাম রেকর্ড করে নিতে হবে। যদি কোন পুরাতন রেকর্ড থাকে এবং সাবেক রেকর্ডের মালিক মারা গিয়ে থাকেন তাহলে তার উত্তরাধিকারীগণ তাদের নাম ঠিকানা বর্ণনা করে নতুন করে নাম রেকর্ড ভুক্ত করতে আমিনকে সাহায্য করতে হবে।

নামজারীর বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রতিকার

নামজারী কি?

ভূমি ব্যবস্থাপনায় মিউটেশন বা নামজারী একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। জমি ক্রয় বা অন্য কোন উপায়ে জমির মালিক হয়ে থাকলে হাল নাগাদ রেকর্ড সংশোধন করার ক্ষেত্রে মিউটেশন একটি অপরিহার্য নাম। ইংরেজী মিউটেশন(Mutation) শব্দের বাংলা অর্থ হলো পরিবর্তন।

আইনের ভাষায় এই মিউটেশন শব্দটির অর্থই হলো নামজারী। নামজারী বা নাম খারিজ বলতে নতুন মালিকের নামে জমি রেকর্ড করা বুঝায়। অর্থাত্ পুরনো মালিকের নাম বাদ দিয়ে নতুন মালিকের নামে জমি রেকর্ড করাকে নামজারী/নাম খারিজ বলে। ভূমি মালিকানার রেকর্ড বা খতিয়ান বা স্বত্বলিপি হালকরণের জন্য জরিপ কার্যক্রম চূড়ান্ত করতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। যে সময়ের মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে, এওয়াজ সূত্রে বিক্রয়, দান, খাস জমি বন্দোবস্ত ইত্যাদি ভূমি মালিকানার পরিবর্তন প্রতিনিয়ত ঘটতে থাকে। যে কারণে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল ভূমি মালিকানার রেকর্ড হালকরণের সুবিধার্থে জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারায় কালেক্টরকে (জেলা প্রশাসক) ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এই ক্ষমতা বলে জমা, খারিজ ও নামজারী এবং জমা একত্রিকরণের মাধ্যমে রেকর্ড হাল নাগাদ সংরক্ষণ করা হয়।

কমিশনার (ভূমি) ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়েল ১৯৯০ এর ২০ অনুচ্ছেদ বলে নামজারী বা মিউটেশনের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। পূর্বে নামজারীর বা মিউটেশনের দায়িত্ব উপজেলা রাজস্ব বা অফিসার বা সার্কেল অফিসার (রাজস্ব) পালন করতেন।

ভূমির মালিকানা যেমন বিভিন্ন ভাবে অর্জিত হয়

তেমনি নামজারীর ধরনও বিভিন্ন পদ্ধতিতে হয়ে থাকে।

যেমন:

- **হস্তান্তর দলিল (এল.টি নোটিশ) মূলে নামজারী**
- **সার্টিফিকেট মূলে নামজারী**
- **এল.এ মোকদ্দমার ভিত্তিতে নামজারী**
- **আদালতের ডিক্রি মূলে নামজারী**
- **উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির নামজারী**
- **আবেদনের ভিত্তিতে নামজারী**

হস্তান্তর দলিল (এল.টি.নোটিশ) মূলে নামজারী:

দলিল রেজিস্ট্রির পর হস্তান্তর নোটিস (এল.টি. নোটিস) সহকারী ভূমি কমিশনারের অফিসে পাঠাতে হবে। উক্ত নোটিস পাবার পর সহকারী ভূমি কমিশনার তার অফিসে একটি নামজারী কেস নথি খুলে তা তদন্তের জন্য তহসিল অফিসে পাঠাবেন। তহসীলদার সরেজমিনে ও রেকর্ড যাচাই করে বাংলাদেশ ফরম নং ১০৭৮ এ প্রতিবেদন দিবেন।

সার্টিফিকেট মূলে নামজারী:

সার্টিফিকেট মূলে কোন খবর সম্পত্তির নিলাম ক্রেতা নামজারীর আবেদন করলে নিলামের বায়না ও দখলনামার ভিত্তিতে নামজারী আবেদন মঞ্জুর করা যাবে। নিলাম ক্রেতা সরকার হলে, 'রেজিস্ট্রার' (i) I (ii) সংশোধন করতে হবে এবং রেজিস্ট্রার (Viii) এর খন্ড সংশোধন করতে হবে।

এল. এ. মোকদ্দমার ভিত্তিতে নামজারী:

কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান ভূমি অধিগ্রহণ করে নামজারীর আবেদন না করলে কালেক্টরের এল.এ. শাখা হতে ভূমি অধিগ্রহণের (এল.এ) মোকদ্দমার নম্বর ও তফশিল সংগ্রহ করে ঐ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে তাদের নিজ নামে হোল্ডিং খোলার জন্য নোটিশ আবেদন পাওয়া গেলে পেশকৃত কাগজ পত্র যাচাইক্রমে সংশ্লিষ্ট সংস্থার নামে হোল্ডিং খুলে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করতে হবে।

আদালতের ডিক্রিমূলে নামজারী:

আদালতের ডিক্রি মূলে সরকারী খাস জমি এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির নামজারী করা যায় এরূপ ডিক্রির (একতরফা/দোতরফা) এরপর উক্ত জমি পুনরায় রেজিস্ট্রির প্রয়োজন ন।(ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়েল এর ৩২১ অনুচ্ছেদ)তবে এরূপ ডিক্রি মূলে প্রাপ্ত খাস জমির নাম জারীর

আবেদন পাওয়া গেলে একটি নামজারী মোকদ্দমা চালু করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র মতামতের জন্য তা কালেক্টরের (ডি.সি) এর নিকট প্রেরণ করতে হবে।

উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির নামজারী:

কোন হোল্ডিং এর মালিকের মৃত্যুতে (যদি তিনি তার সম্পত্তি নিজ নামে আলাদা হোল্ডিং করে গিয়ে থাকেন) তার উত্তরাধিকারীগণ নিজেদের নাম ঐ হোল্ডিং ভূক্ত করার জন্য সহকারী ভূমি কমিশনারের নিকট দরখাস্ত করতে হবে এবং উক্ত দরখাস্তের সাথে সাকশেসন সার্টিফিকেট প্রদান করতে হবে। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) গণের বরাবরে প্রেরিত ভূমি প্রশাসন বোর্ডের ১৮-৭-১৯৮৪ ইং তারিখের ২০-এ.এস-১৭/৮৪ (১৪০) নং স্মারকের ৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দরখাস্তকারীকে ম্যাজিস্ট্রেট/প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/সংসদ সদস্যের মত জন প্রতিনিধি কর্তৃক প্রদত্ত সাকশেসন সার্টিফিকেট প্রদান করতে হবে।

উত্তরাধিকারী আবেদনকারী সাকশেসন সার্টিফিকেট সহ নামজারীর জন্য সহকারী ভূমি কমিশনারের নিকট দরখাস্ত দাখিল করলে ভূমি সহকারী কমিশনার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যাচাই করে নামজারীর আদেশ দিবেন। এক্ষেত্রে নতুন কোন হোল্ডিং না খুলে মৃত ব্যক্তির নাম কর্তন করে, ফারায়েজ অনুযায়ী হিস্যা/জমির ভাগ বন্টন করে উত্তরাধিকারীদের নাম পূর্বের হোল্ডিং এর জায়গায় হোল্ডিংভুক্ত করলেই চলবে।

=======================================

নামজারী বিষয়ক অধিকার:

- নামজারীর মাধ্যমে নতুন মালিকানা তথা হোল্ডিং সৃষ্টি করার অধিকার।(১৯৫০ সালের স্টেট একুইজিশন এন্ড টেনান্সি এক্টের ১৪৩ ধারা)
- নির্ধারিত কোর্ট ফি দিয়ে সহকারী ভূমি কমিশনারের নিকট নাম জারীর জন্য আবেদন করার অধিকার।(ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল ১৯৯০)
- সংশোধিত খতিয়ান সংগ্রহের অধিকার (ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল ১৯৯০)
- ষড়যন্ত্র করে কিংবা ভুলক্রমে অন্যের নামে নামজারী হয়ে থাকলে তা সংশোধনের অধিকার।(১৯৫০ সালের স্টেট একুইজিশন এন্ড টেনান্সি এক্টের ১৪৩ ধারা)
- রাজস্ব অফিসারের আদেশে অসন্তুষ্ট হলে তার বিরুদ্ধে জেলা জজ কিংবা অতিরিক্ত জেলা জজ (রাজস্ব)-এর নিকট মামলা করার অধিকার। (১৯৫০ সালের স্টেট একুইজিশন এন্ড টেনান্সি এক্ট ১৪৭ ধারা)
- আপীলের জন্য সময় পাবার অধিকার। (১৯৫০ সালের স্টেট একুইজিশন এন্ড টেনান্সি এক্ট ১৪৮ ধারা)
- রিভিশনের অধিকার (যদি আপীল করা না হয়ে থাকে) (১৯৫০ সালের স্টেট একুইজিশন এন্ড টেনান্সি এক্ট ১৪৭ ধারা)
- রিভিউ পুর্নবিবেচনার অধিকার (১৯৫০ সালের স্টেট একুইজিশন এন্ড টেনান্সি এক্টের ১৪৯ ধারা।)
- জমির ক্রেতা যদি সমবায় সমিতি বা হাউজিং কোম্পানী হয় তাহলে নামজারীর অধিকার। (১৯৯০ সালের ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়ালের ৩২৭,৩২৮ অনুচ্ছেদ)
- **লংঘন:**
- নামজারীর মাধ্যমে জমির মালিকানা সৃষ্টি করতে না দেওয়া।
- সংশোধিত খতিয়ানের কপি সংগ্রহ করতে চাইলে তা প্রদান না করা।
- নামজারীর সংশোধনের জন্য সময় না দেওয়া।
- আপিলের জন্য সময় ও সুযোগ না দেওয়া।
- রিভিশনের জন্য সময় ও সুযোগ না দেওয়া।

- রিভিউ এর জন্য সময় ও সুযোগ না দেওয়া।

সংশ্লিষ্ট প্রতিকার:

- আপিল
- রিভিশন
- রিভিউ

প্রতিকারের জন্য কোথায় যেতে হবে?

- থানা সেটেল্টমেন্ট অফিসে যেতে হবে।
- সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর বরাবরে নামজারীর জন্য লিখিত দরখাস্ত দাখিল করতে হবে।
- বড় এবং জটিল নামজারীর ক্ষেত্রে আইনজীবী নিয়োগ করলে ভালো হয়।

আপিলের সুযোগ আছে কি?

আছে।নামজারীর বিষয়ে কোন ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হলে জেলা প্রশাসকের নিকট আপিল করা যাবে। (১৯৫০ সালের স্টেট একুইজিশন এন্ড টেনান্সি এক্ট ১৪৮ ধারা

কতদিনের মধ্যে?

- আদেশ প্রদানের তারিখ হতে ৩০ দিনের মধ্যে।
- ডি.সি কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিরূদ্ধে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট ৬০ দিনের মধ্যে আপিল করতে হবে।
- বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিরূদ্ধে ৯০ দিনের মধ্যে আপিল দায়ের করতে হবে।

রিভিশনের সুযোগ আছে কি?

আছে ।(যদি আপিল করা না হয়) অসন্তুষ্ট ব্যক্তির আবেদনের ভিত্তিতে অথবা জেলা প্রশাসক নিজে উক্ত আদেশটি পূর্ননীরিক্ষণ করতে পারবেন। (১৯৫০ সালের স্টেট একুইজিশন এন্ড টেনান্সি এক্টের ১৪৯ ধারা)

কতদিনের মধ্যে?

- প্রদত্ত আদেশের তারিখ হতে ১ (এক) মাসের মধ্যে।
- প্রদত্ত আদেশের তারিখ হতে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট রিভিশনের জন্য আবেদন করতে হবে।
- প্রদত্ত আদেশের তারিখ হতে ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ভুমি প্রশাসন বোর্ড নিজের উদ্যোগে অথবা আবেদনের ভিত্তিতে।

রিভিউ করার অধিকার আছে কি?

'আছে।' (যদি আপিল বা রিভিশন করা না হয়)
(১৯৫০ সালের স্টেট একুইজিশন এন্ড টেনান্সি এক্ট ১৫০ ধারা।)

কতদিনের মধ্যে?

- পূর্ববর্তী আদেশ প্রদানের তারিখ হতে ৩০ দিনের মধ্যে রিভিউ এর জন্য আবেদন করতে হবে।

সাহায্যকারী সংগঠন :

"জাতীয় আইন সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা"
(প্রত্যেক জেলার জেলা জজ সাহেবের অফিস)
বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট ("ব্লাস্ট")

১৪১/১,সেগুন বাগিচা,ঢাকা-১০০০ ।
ফোন নম্বর- ৮৩১৭১৮৫,৯৩৪৯১২৬ ।
“মাদারীপুর লিগ্যাল এইড এসোসিয়েশন”
নোতাম সাহার, মাদারীপুর ।
ফোন নম্বর-০৬৬১-৫৫৫১৮, ৫৫৬১৮ ।
“**নিজেরা করি**“
৭/৮,ব্লক-সি,লালমাটিয়া,ঢাকা ।
ফোন নম্বর-৮১২২১৯৯, ৯১৪৪০৮৫ ।
এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এন্ড ডেভোলপমেন্ট (**“এ.এল.আর.ডি.”**)
বাড়ী নং-৪০,রোড নং-৪/এ, ধানমন্ডি আ/ এ,ঢাকা-১২০৯ ।
ফোন নম্বর-৯৬৬২৫০৩,৯৬৭১১৭২ ।
(ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল ১৯৯০ এর ৩২১ অনুচ্ছেদ)।

লংঘন:

- নামজারীর মাধ্যমে জমির মালিকানা সৃষ্টি করতে না দেওয়া।
- সংশোধিত খতিয়ানের কপি সংগ্রহ করতে চাইলে তা প্রদান না করা।
- নামজারীর সংশোধনের জন্য সময় না দেওয়া।
- আপিলের জন্য সময় ও সুযোগ না দেওয়া।
- রিভিশনের জন্য সময় ও সুযোগ না দেওয়া।
- রিভিউ এর জন্য সময় ও সুযোগ না দেওয়া।

সংশ্লিষ্ট প্রতিকার:

- আপিল
- রিভিশন
- রিভিউ

প্রতিকারের জন্য কোথায় যেতে হবে?

- থানা সেটেল্টমেন্ট অফিসে যেতে হবে।
- সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর বরাবরে নামজারীর জন্য লিখিত দরখাস্ত দাখিল করতে হবে।
- বড় এবং জটিল নামজারীর ক্ষেত্রে আইনজীবী নিয়োগ করলে ভালো হয়।

আপিলের সুযোগ আছে কি?

আছে।নামজারীর বিষয়ে কোন ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হলে জেলা প্রশাসকের নিকট আপিল করা যাবে। (১৯৫০ সালের স্টেট একুইজিশন এন্ড টেনান্সি এক্ট ১৪৮ ধারা

কতদিনের মধ্যে?

- আদেশ প্রদানের তারিখ হতে ৩০ দিনের মধ্যে।
- ডি.সি কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিরূদ্ধে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট ৬০ দিনের মধ্যে আপিল করতে হবে।
- বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিরূদ্ধে ৯০ দিনের মধ্যে আপিল দায়ের করতে হবে।

রিভিশনের সুযোগ আছে কি?

আছে ।(যদি আপিল করা না হয়) অসন্তুষ্ট ব্যক্তির আবেদনের ভিত্তিতে অথবা জেলা প্রশাসক নিজে উক্ত আদেশটি পূর্ননীরিক্ষণ করতে পারবেন। (১৯৫০ সালের স্টেট একুইজিশন এন্ড টেনান্সি এক্টের ১৪৯ ধারা)

কতদিনের মধ্যে?

- প্রদত্ত আদেশের তারিখ হতে ১ (এক) মাসের মধ্যে।
- প্রদত্ত আদেশের তারিখ হতে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট রিভিশনের জন্য আবেদন করতে হবে।
- প্রদত্ত আদেশের তারিখ হতে ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ভুমি প্রশাসন বোর্ড নিজের উদ্যোগে অথবা আবেদনের ভিত্তিতে।

রিভিউ করার অধিকার আছে কি?
'আছে।' (যদি আপিল বা রিভিশন করা না হয়)
(১৯৫০ সালের স্টেট একুইজিশন এন্ড টেনান্সি এক্ট ১৫০ ধারা।)
কতদিনের মধ্যে?

- পূর্ববর্তী আদেশ প্রদানের তারিখ হতে ৩০ দিনের মধ্যে রিভিউ এর জন্য আবেদন করতে হবে।

সাহায্যকারী সংগঠন :
"জাতীয় আইন সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা"
(প্রত্যেক জেলার জেলা জজ সাহেবের অফিস)
বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট ("ব্লাস্ট")
১৪১/১,সেগুন বাগিচা,ঢাকা-১০০০ ।
ফোন নম্বর- ৮৩১৭১৮৫,৯৩৪৯১২৬ ।
"মাদারীপুর লিগ্যাল এইড এসোসিয়েশন"
নোতাম সাহার, মাদারীপুর ।
ফোন নম্বর-০৬৬১-৫৫৫১৮, ৫৫৬১৮ ।
"**নিজেরা করি**"
৭/৮,ব্লক-সি,লালমাটিয়া,ঢাকা ।
ফোন নম্বর-৮১২২১৯৯, ৯১৪৪০৮৫ ।
এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এন্ড ডেভোলপমেন্ট ("এ.এল.আর.ডি.")
বাড়ী নং-৪০,রোড নং-৪/এ, ধানমন্ডি আ/ এ,ঢাকা-১২০৯ ।
ফোন নম্বর-৯৬৬২৫০৩,৯৬৭১১৭২ ।
(ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল ১৯৯০ এর ৩২১ অনুচ্ছেদ)।